নূতন প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক
উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়সমূহের **ষষ্ঠ শ্রেণীর** বাংলা গদ্য
আবশ্যিক দ্রুত-পঠন-বিষয়ক পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
(Vide Notification No. Syl./72/54, dated, Calcutta, the 18th December, 1954)

সেকালের গল্প

প্রথম ভাগ

॥ ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য ॥

সুশীল জানা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা ৯
অফিস : ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

একবিংশ মুদ্রণ, নভেম্বর, ১৯৬১

পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের সিদ্ধান্তক্রমে বর্ধিত মূল্য যোগে

৯৫ পয়সা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

প্রত্যেকটি সভ্য জাতিই তাহার প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তিগুলিকে শ্রদ্ধা ও গর্বের বস্তু বলিয়া মনে করে। তাই ওগুলিকে বহুমূল্য উত্তরাধিকাররূপে এক যুগ আর এক যুগের হাতে তুলিয়া দিয়া যায়। এইভাবেই ঐতিহ্য স্মরণীয় হইয়া থাকে, এইভাবেই একটি জাতির উন্নত চিন্তাধারা ও সৃষ্টির নৈপুণ্য নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত ও অগ্রসর হইয়া চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই মহামান্য রাজ্যটি রক্ষা করিয়া রাখিবার জন্য সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই দেখা যায় নানা আয়োজন—প্রাচীন কীর্তিগুলিকে তাহারা নানাভাবে নানা বয়সের উপযোগী করিয়া আস্বাদন করে, স্মরণে রাখে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-কীর্তি অল্প নহে, অগৌরবেরও নহে এবং পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার এই কীর্তি ও সমৃদ্ধি অতুলনীয়। কিন্তু সে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলিয়া ধরিবার মত নানা আয়োজন আমাদের নাই। সেদিক দিয়া আমরা আত্মবিস্মৃত—দরিদ্র।

অথচ আমাদের আত্মবিস্মৃত এই দারিদ্র্যের পশ্চাতে একটা বিরাট ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্য পড়িয়া আছে—বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের গল্পকথা রাজ্য। জগতের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া গোটা মধ্য যুগটা নানা আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। শুধু বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস নন—ভারতের ধর্মে দর্শনে গল্প, তার উপদেশমালায় গল্প, তার জীবন ও কল্পনায় গল্প। তাহার আদিম যুগের পশু-পাখী, অসুর-রাক্ষস, প্রাণ ও আত্মার উপকথা শেষ পর্যন্ত পরিণত হইয়াছিল মানুষের কথায়, তাহার সহিত প্রাচীন অলৌকিকতার বিশ্বাস যতটাই মিশিয়া থাকে। এই গল্পের রাজ্য যে শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবলম্বন তপোবন আর রাজসভাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে—সাধারণ গ্রামবৃদ্ধদের মুখ হইতে কাশল কাশ্মীর

অন্দরমহল পর্যন্ত ইহা প্রসারিত ছিল। গল্প-কথার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সত্যসত্যই বাগ্দরাজেশ্বর এবং জগতের বহু দেশে সে তাহা অকৃপণ হাতে বহুকাল হইতেই বিলাইয়া আসিয়াছে; গান্ধারের কোন সরাইখানা হইতে অথবা মণিমুক্তার কোন বাণিজ্য তরণী হইতে কে কবে ইহাদের ভিন্ন দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল জানি না! তবে ম্যাক্সমুলার সাহেব প্রাচীন বৈদিক-কথার অনেক ইওরোপীয় সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন, আমাদের 'করটক ও দমনক'-কথা সিরিয়া ও আরবে যথাক্রমে 'কলিলগ ও দমনগ' এবং 'কলিলা ও দিমনা' রূপে বেশ পরিবর্তন করিয়াছিল, আমাদের জাতক-মালার বহু কাহিনী ঈশপের হাতে নূতন করিয়া পরিবেশিত হইয়াছিল। গল্পকথায় আমাদের কিশোর-কিশোরীদের আমন্ত্রণ নাই বলিলেই চলে। 'সেকালের গল্প' তাহাদের সেই আমন্ত্রণ।

এই প্রাচীন রাজ্যের পরিক্রমণ শেষ করিয়াছি আমাদের বাঙলার গ্রামের ছায়ায় আসিয়া—যেখানে আমাদের পল্লীকবি ও কথকের কণ্ঠে গোপীচন্দ্র ও কাজলরেখার করুণকাহিনী একদিন পুরাতন যুগের শেষ মানুষগুলির মর্ম স্পর্শ করিয়া শেষ হইয়াছিল। সময়ের হিসাবে ইহার পরে ইংরাজ অভ্যুদয় এবং নূতন যুগের নূতন সাহিত্য-ধারার কথা। ইহার আগে প্রাচীন যুগ যেন কাজলরেখার মতই তাহার শান্ত গ্রাম্যতা, নির্বোধ সহিষ্ণুতা ও নিঃশব্দ আবেদন লইয়া ধীরে ধীরে শেষ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে সমস্ত সাহিত্য-কীর্তিগুলিকে যে স্পর্শ করিতে পারিয়াছি তাহা নহে। সেদিক দিয়া তিন খণ্ড 'সেকালের গল্প' ঐশ্বর্যপূর্ণ বিরাট এক রাজ্যের দিকে সামান্য একটু পথের ইঙ্গিত মাত্র।

২২. ১২. ৫৪ — লেখক

উৎসর্গ

শ্রীমতী শেফালি চৌধুরী

কল্যাণীয়াসু

সূচীপত্র

সত্যপালন

একদা দেবতাদের রাজ্যে শোনা গেল মহা হট্টগোল। দেবতাদের যতগুলি গাভী ছিল সব কাহারা যেন চুরি করিয়া গা ঢাকা দিয়াছে। সেই দুঃখে দেবতারা সব 'হায় হায়' করিতেছেন। এবার ভোগের মধ্যে সেরা যে ভোগ দুধ, ঘি, ছানা, মাখন—সব বুঝি বন্ধ হয়।

দুঃখে দেবতারা মুষড়াইয়া পড়িলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। তাঁহাকে খুশী রাখিবার জন্য অপ্সরাগণ নাচগান শুরু করিতে যাইতেছিল—ইন্দ্র তাহাদের বকিয়া দিলেন। একে বকিলেন—ওকে বকিলেন। ইন্দ্রাণী রাগ করিয়া গোসা-ঘরে ঢুকিলেন। বসন্ত ভয়ে চির-শীতের রাজ্য হিমালয়ে গিয়া লুকাইল। কোকিল আর ডাকিল না। নন্দনকাননের পারিজাত আর ফুটিল না। স্বর্গরাজ্য ম্লান।

হা-হুতাশ করিতে করিতে দেবতারা গেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। দেবরাজ সমস্ত দেবতাদের লইয়া সভা করিয়া বসিলেন।

জোর আলোচনা চলিল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেবতা মিলিয়া ঠিক করিলেন—গোরু-চোরের সঙ্গে লড়াই করা হউক।

লড়াই তো হইবে কিন্তু সে চোর কোথায়? সে চোরই বা কে? এটাই যে এক মহামুশকিলের কথা। দেবতারা ফাঁপরে পড়িলেন।

দেবসভার এক কোণে কুকুর-জননী সরমা কুণ্ডলী পাকাইয়া দেবতাদের সমালোচনা ও হুংকার শুনিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন 'সরমা, চোর খুঁজে বার করো। এ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।'

দেবরাজের কথায় সরমা উঠিয়া বসিল। কিন্তু তাহার মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। মনে তাহার দুঃখ। দেবলোকের কুকুর হইলে কি হইবে, তাহার ভোগের মধ্যে দেবতাদের দুধ, ঘি, ছানা, মাখনের ছিটাফোঁটাও নাই। সময় ও সুযোগ পাইয়া সে মনের দুঃখে কথাটা বলিয়া ফেলিল, 'দেবরাজ ইন্দ্র, যেমন ক'রে হোক গোরুর সন্ধান আমি এনে দেবই, কিন্তু আমার সন্তান-সন্ততিদের একটু ক'রে দুধ খেতে দেবে বলো?'

ইন্দ্র বলিলেন, 'তথাস্তু, তাই হবে। তুমি চোর আর গোরু খুঁজে বের করো।'

শিকারী কুকুরের মত সরমা ছুটিল গোরুর সন্ধানে। অনেক পাহাড় নদী জঙ্গল পার হইয়া সরমা ছুটিল। নদী তাহাকে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল, পাহাড় জঙ্গল তাহার পথ করিয়া দিল।

অনেক দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সরমা ক্লান্ত। তবু তাহার বিরাম নাই। দেবতাদের কাছে কথা রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া এতদিন পরে তাহার বংশধরদের কপালে একটু দুধ খাইবার সুযোগ আসিয়াছে—তাহা নষ্ট করিলে চলিবে না। সরমা দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গোরু খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় দেবতাদের গোরু।

হঠাৎ একদিন সে পাহাড়-ঘেরা এক দেশের সীমান্তে আসিয়া গোরুর ডাক শুনিতে পাইল। একটি দুটি গোরু নয়—একপাল গোরু-বাছুরের ডাক। সরমা থমকিয়া দাঁড়াইল। কান খাড়া করিয়া শুনিল—পাহাড়ের দিকেই যেন গোরু-বাছুরের ডাক শোনা যাইতেছে। গেল সে পাহাড়ের দিকে। কিন্তু কোথায়

গোরু ? পাহাড় জঙ্গল সে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল—কিন্তু গোরুর দেখা পাইল না। অথচ পাহাড়ের দিকেই বাতাসে যে গোরুর ডাক কাঁপিতেছে। সরমা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল। যেমন করিয়াই হোক এ রহস্য ভেদ করিতে হইবে।

পাহাড় জঙ্গল ছাড়িয়া সরমা চলিল লোকালয়ের দিকে।

সে রাজ্য হইল পণি নামক অসুরদের। তাহারা বণিক—ধনবান। সরমাকে আসতে দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইল। এমন সুন্দর কুকুর তাহারা কখনো দেখে নাই। যতই হোক, কুকুরজননী সরমা দেবলোকের কুকুর! তাহার রূপে পথ আলো। সবাই তাহাকে আদর করিয়া ডাকিল, যত্ন করিয়া খাইতে দিল। সরমা পাইল নূতন আশ্রয়, ভালো ভালো খাবার আর সকলের আদর যত্ন। পণিদের সহিত সরমা দিব্যি বন্ধুত্ব করিয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে তাহাদের মাঠ-ঘাট, ঘর-দুয়ার সব জানিয়া ফেলিল। কিন্তু গোরু কোথায় ? সেইটাই সে কোনো রকমে জানিতে পারিল না। অথচ গোরু-বাছুরের ডাক শোনা যায় পাহাড়ে-জঙ্গলে আকাশে-বাতাসে।

পণিদের ক্ষেতখামার, ধনসম্পদ পাহারা দিতে দিতে একদিন সে গোরুগুলির সন্ধান পাইয়া গেল। উঁকি মারিয়া দেখিল, পণিরা দেবতাদের গোরুগুলিকে পাহাড়ের গভীর গুহায় অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

এতদিনের এত সন্ধান, এত কষ্টের শেষ হইল। সরমাকে

তখন আর পায় কে ! পণিদেব দেশ ছাড়িয়া একদিন সে ধরিল আবার দেবলোকের পথ ।

পণিরা অবাক হইয়া শুধাইল, 'সরমা, কোথায় যাও ?'

সরমা বলিল, 'দেবরাজ ইন্দ্রেব দূতী হয়ে আমি এসেছিলাম। দেবতাদের অনেক গোধন তোমরা চুরি কবে লুকিয়ে রেখেছ। ইন্দ্রের হাতে এবার তোমরা মারা পড়বে। দাঁড়াও একবার দেবলোকে ফিরে যাই ।'

পণিরা বলিল 'সে যে অনেক— অনেক দূবের পথ ! এ পথে আসতে হলে, একবার পিছন ফিরে তাকালে আর আসা যায় না। তা ছাড়া, পথের মাঝখানে আছে কত বড় বড় নদী ।'

সরমা বলিল, 'নদীর জল আমাকে ভয় পায় '

পণিরা তখন সরমার রূপ ও গুণেব সুখ্যাতি করিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল, 'শোন শোন সুন্দবী সরমা, আমাদের কাছে ফিরে এসো। দেবলোক থেকে যখন এতটা পথ এসেছ তুমি—যে ক'টা গোরু চাও নাও। ভেবে দেখ একবার—বিনা যুদ্ধে এ গোরু কেউ কাউকে দেয না ।'

এ প্রলোভনে সরমা ভুলিল না। বলিল, 'ইন্দ্র তোমাদের পাপের শাস্তি দেবেন। তাঁর শক্তি তো জানো না ।'

পণিরা তখন ভয় আর হুমকি দেখাইয়া বলিল, 'আমাদের গোরু-ঘোড়া, ধন-সম্পদ আর এই দেশ—সব বড় বড় পাহাড়

দিয়ে ঘেরা। আমাদের মহাবীর যোদ্ধারা সে সব রক্ষা করছে। তা ছাড়া, আমাদের কত রকমের ধারাল সব অস্ত্রশস্ত্র আছে জানো ?'

সরমা বলিল, 'ভালয় ভালয় গোরুগুলি ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের দর্প চূর্ণ হবে।' এই বলিয়া সরমা দেবলোকের দিকে চলিতে লাগিল।

বিপদ বুঝিয়া পণিরা নানাভাবে সরমার মন ভাঙাইবার চেষ্টা করিল। নানা রকমের লোভ দেখাইল। বলিতে লাগিল, 'শোন শোন সুন্দরী সরমা, বুঝতে পারছি—দেবতারা তোমাকে ভয় দেখিয়ে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি ফিরে এসো—তোমার কোনো ভয় নেই। তোমাকে আমরা বোনের মত রক্ষা করবো। আদর করবো. যত্ন করবো। গোরু দেবো অনেক।'

এই গোরুর দুধ একটুর জন্য সরমার মনে বড় দুঃখ ছিল।—তার সন্তান-সন্ততিরা দুধ পায় না। ইহার জন্য ইন্দ্রের কাছে তাহাকে প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। আর এখন পণিরা সেই সব গোরুর ভাগ দিবে বলিয়া তাহাকে কত সাধাসাধি করিতেছে। এ দেশে থাকিয়া গেলে সরমার কত সুখভোগ, কত আদর আর কত যত্ন।

সরমা পণিদের দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। হয়তো সে ফিরিয়া আসিবে—এই আশায় পণিরা বার বার আদর করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'ফিরে এসো সরমা সুন্দরী, ফিরে এসো।'

সরমা আব দাঁড়াইল না। ঘৃণায মুখ ফিবাইয়া লইয়া দেব-লোকেব দিকে চলিতে লাগিল। না—এখানে যত সুখই থাক, দেবলোক যে তাহাব স্বদেশ। কেমন কবিযা স্বদেশকে সে ভুলিযা থাকিবে? কেমন কবিযা সে বিশ্বাসঘাতিনী হইবে?

দেবলোকেব কুকুব জননী—দেবলোকে আবাব ফিবিযা চলিল।

সবমা ইন্দ্রদেব সন্ধান লইযা ফিবিল। দেবতাবা 'ধন্য ধন্য' কবিতে লাগিলেন। তাবপব দেববাজ্যে উঠিল 'সাজ সাজ' রব। দেববাজ ইন্দ্র যুদ্ধেব জন্য সাজসজ্জা কবিলেন। ইন্দ্রেব আগে আগে ছুটিল মহাবডেব দেবতা মরুৎ। স্বর্গ-মর্ত জুড়িয়া উঠিল ভীষণ ঝড। ঘন ঘন বজ্রাঘাতে পণিদেব সেই পাহাড-ঘেরা দেশে হাহাকাব পড়িযা গেল। ইহাব গভীব অন্ধকাবে বন্দী গোরুগুলিকে উদ্ধাব কবিযা দেববাজ ইন্দ্র আবাব দেবলোকে ফিবিযা আসিলেন।

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল হইতে)

যজ্ঞের বলি

আদিকালের সে এক রাজা—নাম ছিল তাঁহার হরিশ্চন্দ্র। রাজার অন্নের অভাব নাই—এটা খান, ওটা খান। বস্ত্রের অভাব নাই—শীতে জলে হি-হি করিয়া কাঁপিতে হয় না। সোনা-দানা অঢেল—রাজার মাথায় মুকুট, কানে কুণ্ডল, কোমরে চন্দ্রহার। ইহা ছাড়াও ঘর-আলো-করা একশ' রানী। রাজার একশ'টা শ্বশুরবাড়ী হইতে কত শত গোরু ঘোড়া ছাগল যে যৌতুক আসিয়াছে তাহার গোনা গুন্‌তি নাই।

রাজা দিব্যি ছিলেন মনের সুখে। কিন্তু যত গোলমালের গোঁসাই নারদ মুনি আসিয়া এক দিন এক কাণ্ড বাধাইয়া দিলেন। রাজাকে তিনি বলিলেন, 'তোমার ও সব কিছু নয়। ভাল মন্দ খেয়ে পরে সোনা-দানায় দিব্যি সেজেগুজে থাকা যায় বটে, আর বিয়ে করলেই অনেক গোরু ঘোড়া যৌতুকও পাওয়া যায় বটে,

কিন্তু সব থাকতেও ঘর তোমার অন্ধকার। কারণ তোমার ছেলে-পুলে নেই।'

রাজা বলিলেন, 'তবে উপায় ?'

নারদ বলিলেন, 'তুমি বরুণ দেবতার কাছে মানত কর। বলো যে, ছেলে হলে তাকে বলি দিয়ে যজ্ঞ করবে।'

রাজা মানত করিলেন।

বরুণ দেবতা খুশী হইয়া বর দিলেন। রাজপুত্রের জন্ম হইল। রাজা তাহার নাম রাখিলেন রোহিত। আনন্দ-উৎসবে রাজা আর তাঁহার একশ' রানী মাতিয়া উঠিলেন।

বরুণ দেবতা একদিন আসিয়া বলিলেন, 'কই রাজা, যজ্ঞ করে ছেলে বলি দিলে না তো ?'

রাজার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আহা, এই একরত্তি ছেলে, তাহার জন্মের পর দশটা দিনও এখনও কাটে নাই। কিন্তু উপায় নাই—যজ্ঞের বলি রাজাকে দিতেই হইবে। এমনি ছিল নিয়ম। রাজা বলিলেন, 'দশটা দিন যাক—তখন যজ্ঞ করব।'

শুধু দশ দিন নয়, দশ মাস গেল, দশ বছর গেল। রাজা নানান কথা বলিয়া বরুণ দেবতাকে ফিরাইতে লাগিলেন। কখনো বলিলেন, 'দুধে দাঁত উঠুক।' কখনো বলিলেন, 'দুধে দাঁত ভাঙুক।' কখনো বা বলিলেন, 'আসল দাঁত উঠুক।'

বরুণ দেবতা বার বার ফিরিয়া গেলেন।

রাজা শেষবার বলিলেন, 'পশু বলি আর মানুষ বলিতে তফাত আছে তো ঠাকুর। রোহিত আবার ক্ষত্রিয়ের ছেলে। ক্ষত্রিয়ের ছেলে যতদিন না ধনুবাণ ধরতে শেখে ততদিন সে বলির যোগ্য হয় না। এই তো শাস্ত্রের নিয়ম।'

বরুণ দেবতা সেবারেও ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রাজা রোহিতকে ধনুর্বিদ্যা শিখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—যাহাতে সে তাড়াতাড়ি একটা মস্ত বীর হইয়া উঠিতে পারে। হইলও তাহাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রোহিত ধনুর্বিদ্যা শিখিল—রোহিত হইল মস্ত বীর। তখন নিজেকে রক্ষা করিবার মত তাহার সাহস হইল, শক্তি হইল।

এদিকে বরুণ দেবতা একদিন আসিয়া হাজির। রাজার বুক কাঁপিয়া উঠিল। রোহিতকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'বাছা, বরুণের দয়াতেই তোকে পেয়েছিলাম। কথা ছিল—তোকে যজ্ঞে বলি দেবো।'

রোহিত বীরদর্পে বলিল, 'তা কখনো হতে পারে না।'

এই বলিয়া সে হাতে ধনুবাণ লইয়া রাজ্য ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল। বলির জন্য কেহ তাহাকে ধরিতে সাহস পাইল না।

কিন্তু জলের দেবতা বরুণ তাহাকে ছাড়িলেন না। রোহিতের হইল উদরী রোগ—জলের দেবতা শেষটায় চটিয়া তাহার পেটের মধ্যে জল চালান করিয়া দিলেন। পেটটা ফুলিয়া হইয়া উঠিল জয়ঢাক। শরীর হইল দুবল। হাত-পা হইল কাঠির

মত। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া বছরখানেক পরে রোহিত তখন বন ছাড়িয়া ঘরে ফিরিবার পথ ধরিল। মনে বিশ্রামের আশা।

রোহিতকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের কি জানি মনে হইল—ছুটিলেন তিনি ব্রাহ্মণের বেশে। হয় তো ভাবিলেন—ঘরে বিশ্রাম লইতে গেলে রোহিত আর বাঁচিবে না। তাই ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া রোহিতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'ওহে রোহিত চলে বেড়াও—তাতে তোমার অনেক লাভ। বসে থাকলে সেরা মানুষেরাও অনেক কষ্ট পায়। যে চলে বেড়ায়—ইন্দ্র তার সখা। তাই বলছি, তুমি চল—চল—চল।'

পূজনীয় এক ব্রাহ্মণ তাহাকে চলিয়া বেড়াইতে বলিতেছেন—এই ভাবিয়া রোহিত সারা একটা বছর বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যেমনি আবার ঘরে ফিরিতে যাইবে অমনি ইন্দ্র সেই ব্রাহ্মণের বেশে সামনে আসিয়া হাজির। রোহিতের কাঠির মত পা দুইটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন যে, 'যে লোক ঘুরে বেড়ায় তার হাত পা হয় ফুল-ধরা গাছের মত সুন্দর, দেহ যেন হয় ফল-ধরা গাছ। চলে বেড়ানোর যে পরিশ্রম—তার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই রোহিত। তাতে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলছি, তুমি চল—চল—চল।'

এমনি ভাবে রোহিত যতবার দেশে ফিরিয়া আসিতে চাহিল ততবারই ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া রোহিতকে বাধা দিলেন। চলিয়া বেড়াইলে যে তাহার লাভ হইবে—এই কথাটা বার বার

নানা ভাবে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে, সে হ'ল ঘোর কলির লোক। যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে—সে দ্বাপর যুগের লোক। যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়—সে হ'ল ত্রেতাযুগের লোক। আর যে চলে বেড়ায়—তার ভাগ্যে নানা দিকে লাভ, সে সত্যযুগের লোক। দেখ সূর্যের মাহাত্ম্য, তিনি চলছেন—চলছেন—চলছেন। তাই বার বার করে বলি, তুমিও চলে বেড়াও রোহিত—চল—চল।'

তাঁহার কথা শুনিয়া শুনিয়া রোহিতও বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু বরুণের অভিশাপে পেটে তাহার জল জমিয়া তেমনি জয়ঢাক হইয়া রহিল। এমনি করিয়া কাটিয়া গেল দুটি বছর। রোহিত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইল।

শেষ বছরে রোহিত বনের মধ্যে এক ঋষিকে দেখিতে পাইল। ঋষি বড় গরীব। তাঁহার নাম অজীগর্ত। তাঁহার আশ্রম-কুটিরের অবস্থা বড়ই খারাপ। গোরু-বাছুর, ঘোড়া-ভেড়া-একটিও নাই। না-আছে ঘরে এক মুঠা যব ধান। থাকার মধ্যে আছে শুধু স্ত্রী আর তিনটি ছেলে। ছেলেদের নাম হইল শুনঃপুচ্ছ, শুনশেফ ও শুনোলাঙ্গুল। তাহাদের খাওয়াতে পরাইতে ঋষি একেবারে নাজেহাল।

রোহিত একটা মতলব আঁটিয়া অজীগর্তের আশ্রমে গিয়া হাজির হইল। অজীগর্তকে ডাকিয়া বলিল, 'ঋষি, তোমাকে

একশ'টা গোরু দেবো, কিন্তু তোমার একটি ছেলেকে দিতে হবে।'

অজীগর্ত বলিলেন, 'ছেলে নিয়ে কি করবে?'

রোহিত বলিল, 'আমার বদলে তাকে যজ্ঞে বলি দিয়ে বরুণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হব।'

ঋষির বড় অভাব—তাই রাজী হইলেন। কিন্তু বড় ছেলেটিকে ঋষি কাছে টানিয়া লইলেন। যতই হউক—সে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে, বাপকে সাহায্য করিতে পারিবে। তাহার হাত ধরিয়া ঋষি বলিলেন, 'আমি কিন্তু একে কিছুতেই দেবো না।'

একেবারে ছোট ছেলেটি এখনো অসহায়। তাহার মা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আমি কিন্তু একে কিছুতেই দেবো না।'

বাকী রহিল মাঝেরটি। সে বেচারী শুনঃশেফ। রোহিত অজীগর্তকে একশ' গাই-গোরু দিয়া শুনঃশেফকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ফিরিল।

রাজার ছেলে রোহিত—ধনদৌলতের অভাব নাই। তাই একশ' গোরুর বদলে শুনঃশেফকে যজ্ঞের বলি হিসাবে পাইতে কষ্ট হইল না। বাপকে আসিয়া বলিল, 'বরুণের যজ্ঞে শুনঃশেফকে বলি দিয়ে আমি মুক্ত হতে চাই।'

হরিশ্চন্দ্র তখন বরুণকে বলিলেন, 'রোহিতের বদলে আমি এই শুনঃশেফকে দিয়ে তোমার যজ্ঞ করব।'

বদল হোক, যাই হোক যজ্ঞের বলি দিতে হইবে।—এই ছিল তখন নিয়ম। বরুণ দেবতা খুশী হইয়া বলিলেন, 'সে তো খুব ভালো। ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলের তো বলি হিসাবে আদর আরো বেশী। এবার তবে যজ্ঞ কর।'

হরিশ্চন্দ্র এবার রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন।

সে এক বিরাট যজ্ঞ। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠের মত বড় বড় ঋষিরা যজ্ঞ করিতে আসিলেন। স্বয়ং বিশ্বামিত্র হইলেন যজ্ঞের হোতা—পুরোহিত। শুনঃশেফ বেচারী একপাশে বলির পশুর মত বসিয়া রহিল।

কিন্তু বলির সময়ে লাগিল গোলমাল। তাঁহাকে হাঁড়িকাঠে বাঁধিবে কে?

কেহই রাজী হইল না।

তখন গরীব অজীগর্ত বলিলেন, 'আমাকে যদি আরো একশ' গাই-গোরু দাও, তাহলে আমি বাঁধতে পারি।

হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে 'আরো একশ' গাই-গোরু দিলেন। অজীগর্ত আগাইয়া নিজের ছেলেকে হাঁড়িকাঠে বাঁধিলেন।

কিন্তু বাঁধা তো হইল—তারপর কাটিবে কে?

কেহই রাজী হইল না।

তখন লোভী অজীগর্ত আবার বলিলেন, 'আমাকে যদি আরো একশ' গাই-গোরু দাও, তাহলে আমি কাটিতে পারি।'

হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে আরো একশ' গাই-গোরু দিলেন। অজীগর্ত শাণিত খড়্গ হাতে লইয়া হাজির হইলেন।

বেচারী শুনঃশেফ সকলের মুখের দিকে একবার কাতর চোখে চাহিয়া দেখিল—কাহারো মুখে দয়ার চিহ্ন নাই। সবাই ব্যস্ত—যজ্ঞ যাহাতে ভালোভাবে শেষ হয়। শুনঃশেফ বুঝিতে পারিল—ইহারা কেহই তাহাকে বাঁচাইতে আসিবে না। তাই মনে মনে সে কাতরভাবে ব্রহ্মাকে ডাকিতে লাগিল। ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি অগ্নি দেবতার আশ্রয় নাও।'

শুনঃশেফ অগ্নির বন্দনা করিয়া তাঁহার আশ্রয় চাহিল। অগ্নি বলিলেন, 'তুমি সূর্য দেবতার আশ্রয় নাও।'

শুনঃশেফ তখন সূর্যের বন্দনা গান করিয়া তাঁহার আশ্রয় চাহিল। কিন্তু সমস্ত দেবতাই এ উহার নাম করিয়া যেন এড়াইতে লাগিলেন।

শুনঃশেফ সকলেরই বন্দনা করিয়া আশ্রয় চাহিতে লাগিল। স্বয়ং বরুণ, দুইজন অশ্বিনীকুমার, শেষে দেবরাজ ইন্দ্র—সকলের স্তবস্তুতি করিয়া শুনঃশেফ শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পাইল ইন্দ্রের। তাহার বাঁধন আপনি খুলিয়া গেল। ইন্দ্র তাহাকে সোনার রথ দান করিলেন। ওদিকে বরুণও প্রসন্ন হইলেন। তাই রোহিতের রোগও সারিয়া গেল—তাহার জয়ঢাকের মত পেটটা আস্তে আস্তে কমিয়া গেল।

শুনঃশেফের উপর দেবতার করুণা ও আশীর্বাদ দেখিয়া

ঋষিরা খুশী হইয়া বলিলেন, 'আমাদের এ যজ্ঞ তাহলে তুমিই শেষ ক'রে দাও শুনঃশেফ।'

শুনঃশেফ তখন শাস্ত্রের নিয়ম মতে যজ্ঞ শেষ করিল ঋষি বিশ্বামিত্র তাহার কাজ দেখিয়া খুব বাহবা দিলেন। যজ্ঞ শেষ করিয়া বালক শুনঃশেফ ঋষি বিশ্বামিত্রের কোলে গিয়া চাপিয়া বসিল। ঋষিও তাহাকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করিলেন।

ব্যাপারটা যেন অজীগর্তের ভালো লাগিল না,—না শুনঃশেফের আচরণ, না বিশ্বামিত্রের আচরণ। অজীগর্ত বিশ্বামিত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওহে ঋষি, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও।'

বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'না। আজ থেকে এ হল আমারই ছেলে। শুনঃশেফকে দেবতারা আজ আমার হাতেই দান করেছেন।'

অজীগর্ত তখন শুনঃশেফকে ডাকিতে লাগিলেন, 'শুনঃশেফ, ফিরে আয়। তোর বাপ-পিতামহের বংশ, কত বড় বংশ—সে বংশ ত্যাগ করে যাস নে। আমার কাছে আবার ফিরে আয়।'

শুনঃশেফ বলিল, 'তুমি বাবা হয়েও একশ'টা গোরুর লোভে ছেলেকে কাটতে এসেছিলে। শুদ্ররাও এমন ঘেন্নার কাজ করে না। তুমি চলে যাও—আমার জন্য তো তুমি তিনশ' গোরু পেয়েছ। আর কি।'

অজীগর্ত বলিলেন, 'আমি পাপ করেছি। এখন দুঃখে

আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। তুই ফিরে আয়। যে তিনশ' গোরু পেয়েছি সে তুই এসে নে।'

শুনঃশেফ গেল না। বলিল, 'তুমি যে ঘেন্নার কাজ করেছ— তার পরে আমি আর ফিরতে পারি না। আমাদের পিতা পুত্রের পবিত্র সম্বন্ধ তুমিই চিরকালের জন্য ভেঙে দিয়েছ। তুমি ফিরে যাও।'

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে)

শ্রেষ্ঠতা

মানুষেব দেহে যে প্রাণ, মন, চোখ, কান এবং বাক্য বা কথা বলিবাব শক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে একদিন ভয়ানক ঝগডা লাগিয়া গেল। কে বড? সকলেই নিজেকে বড় বলিয়া ভযানক হট্টগোল পাকাইয়া তুলিল। কোনও বকমে আর মীমাংসা হয় না। শেষ পর্যন্ত ঝগডা মিটাইবাব জন্য তাহারা গেল প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে। সকলে একসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, 'বল, আমাদেব মধ্যে কে সবচেয়ে বড।'

কে বড় প্রজাপতি ব্রহ্মা সবই জানেন। ইঁহাবা সকলেই তাঁহার পুত্র। কিন্তু ঠিক কথাটি বলিয়া কোন ছেলেকেই তিনি চটাইতে চাহিলেন না। বরং ঘুরাইয়া তিনি ছেলেদের উপরেই ভার দিলেন।

তাহারাই ঠিক করুক। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে চলে গেলে এই শরীরের অবস্থা সব চাইতে কাহিল হবে—সেই সর্বশ্রেষ্ঠ।'

সঙ্গে সঙ্গে বাকা-বীর লাফ দিয়া উঠিল। কথা বলার শক্তি তাহার একচেটিয়া। তাই জোর গলায় বলিল, 'এই আমি চললাম। এবার দেখবে—আমি ছাড়া তোমাদের অবস্থাটা কি রকম হয়। মুখটি যখন ফুটবে না তখন সবাই স্বীকার করবে—আমি সবার বড়, সব চাইতে কাজের।'

বাক্য-বীর তো দেহ ছাড়িয়া গেল। কিন্তু শরীর দিব্যি চলিল—শুধু যা মুখটা ফুটে না। কিন্তু এ সংসারে বোবা মানুষেরও দিন চলে। তাই বোবা হইয়াও শরীর ঠিক চলিল। চোখ দিয়া দেখে, কান দিয়া শোনে, মন দিয়া ভাবনা চিন্তা করে, আর বাঁচিয়াই আছে যখন—তখন প্রাণও ঠিক কাজ করিতেছে।

বছরখানেক পরে বাক্য ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—শরীর ঠিক টিকিয়া আছে। আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে, আমার অভাবে তোমাদের দিন চলছিল কেমন?'

বাকি সবাই বলিল, 'মন্দ কি? শুধু মুখে যা কথা বলতে পারিনি। তাছাড়া কানেও শুনেছি, চোখেও দেখেছি, মনে ভাবনা চিন্তা করতে পেরেছি। আর প্রাণে যে বেঁচেছিলাম, সে তো দেখতেই পাচ্ছ।'

জবাব শুনিয়া বাক্য-বীরের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সুড় সুড় করিয়া আবার সে দেহের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

এবার চোখ নাচিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইবার হুমকি দিল। চোখ না থাকিলে দুনিয়া অন্ধকার। সেই গরবে সে বলিল, 'বাক্য তো জব্দ হয়েছে। এখন আমি চলে গেলেই বুঝতে পারবে—আমিই হচ্ছি সবচেয়ে বড়।'

চোখ শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু শরীর চলিতে লাগিল ঠিক। অন্ধ হইলেই তো মানুষ আর মরিয়া যায় না। বছরখানেক পরে চোখ ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে—দেহ তো দিব্যি বাঁচিয়া আছে। তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে, আমার অভাবে তোমরা সব কেমন ছিলে?'

বাকি কজন জবাব দিল, 'ভালো ছিলাম—শুধু চোখে যা দেখতে পাইনি। তাছাড়া কানেও শুনেছি, কথাও বলেছি, মন দিয়ে ভাবনা চিন্তাও করেছি। আর দেখতেই তো পাচ্ছ—প্রাণে বেঁচে আছি ঠিকই।'

চোখের অহংকার ভাঙ্গিল। সে সুড় সুড় করিয়া দেহের মধ্যে নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল।

এবার কানের পালা। সে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য নিঃশব্দে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শরীর আর কানে শুনিতে পাইল না, বধির হইয়া গেল। কিন্তু তাহাতে দেহযন্ত্র একেবারে অচল হইয়া গেল না। লোকে কানে না শুনিয়া দিব্যি বাঁচিয়া থাকে। বছরখানেক গা-ঢাকা দিয়া কান ফিরিয়া আসিল।

আসিয়া দেখিল—দেহ চলিতেছে ঠিক। তবু সে শুধাইল, কি হে, তোমরা সব ছিলে কেমন?'

সবাই জবাব দিল, 'ছিলাম ভালোই—শুধু কানে যা শুনতে পাইনি। তাছাড়া চোখেও দেখেছি, কথাও বলেছি, মন দিয়ে ভাবনা চিন্তাও করেছি। আর দেখতেই তো পাচ্ছ—প্রাণে বেঁচে আছি ঠিকই।'

জবাব শুনিয়া কান যেন কানমলা খাইল। সে-ও সুড় সুড় করিয়া দেহের যথাস্থানে আবার ফিরিয়া গেল।

এবার মন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আগাইয়া আসিল। মনে মনে তাহার গর্ব কম নয়। দেহের মধ্যে সেই যত ভাবনা চিন্তা করিয়া মরে, বিচার বুদ্ধি করিয়া দেহটাকে এদিকে ওদিকে চালায়। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য এবার সে দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু গেল তো গেল। দেহ টিকিয়া রহিল ঠিক, চলিতে লাগিল ঠিক। দেহ শুধু আর ভাবনা চিন্তা করে না—এই যা। দু'চার মাসের বাচ্চা শিশু—তাহার তো কোনও ভাবনা চিন্তা নাই, তবু সে দিব্যি আনন্দে থাকিতে পারে। তেমনি দেহের আর সবাই ভাবনা চিন্তা কোনও কিছু না করিয়াই দিব্যি শিশুর মত দিন কাটাইতে লাগিল।

বছরখানেক পরে মন ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—দেহ টিকিয়া

আছে ঠিক। তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা সব বেঁচে আছ দেখছি হে! ছিলে কেমন?'

সবাই বলিল, 'ছিলাম ভালোই, মনের ভাবনা চিন্তা কিছু ছিল না—এই যা। তাছাড়া চোখেও দেখেছি, কানেও শুনেছি, মুখেও কথা বলেছি। আর দেখতেই তো পাচ্ছ—প্রাণে বেঁচে আছি ঠিকই।'

জবাব শুনিয়া মন বড়ই মনমরা হইয়া সুড় সুড় করিয়া দেহের স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

এবার প্রাণের পালা। কিন্তু তাহার কাজ কেহ দেখিতে পায় না। চোখ দেখে, কান শোনে, বাক্য কথা বলে, মন ভাবনা চিন্তা করে। দেহের মধ্যে ইহাদের কাজকর্মই চোখে পড়ে সকলের। প্রাণের তেমন কাজ চোখে পড়ে কই? তাই তাহাকে আর চার ভাই আমলই দিতে চায় না।

প্রাণ থাকে চুপচাপ বটে কিন্তু সে জানে—সে-ই সবচেয়ে বড়। আগে প্রাণ শরীরে থাকিবে—তবে তো দেহ বাঁচিবে, তবে তো চোখ, কান, মন ও বাক্যের কাজ। চুপচাপ থাকে সে দেহের মধ্যে—কাজও করে চুপচাপ। চোখ, কান, মন ও বাক্যকে আসলে টিকাইয়া রাখে সে-ই।

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত প্রাণ দেহ ছাড়িবার জন্য উঠিল। কিন্তু দেহ ছাড়িবার মতলবে সামান্য নড়িয়া উঠিতেই চোখ, কান, মন আর বাক্যের সব কিছু থামিয়া

যাইবার পালা, অসাড় হইয়া পড়িবার পালা। মহা বিপদ দেখিয়া চোখ, কান, মন ও বাক্য তখন প্রাণের পায়ে আসিয়া পড়িল। বলিতে লাগিল, 'যেয়ো না ভাই—যেয়ো না দেহ ছেড়ে; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ। তোমারই জয়। তুমিই আমাদের রাজা। তোমার জীবনই আমাদের জীবন। তোমার পুষ্টিতেই সকলের পুষ্টি। তোমার জয়েই সকলের জয়।'

চোখ, কান, মন ও বাক্য সকলে একের পর এক প্রাণের বন্দনা গান করিতে লাগিল, 'হে প্রাণ, তুমিই আমাদের আশ্রয়, তোমার মহিমাই আমাদের মহিমা, তোমার শক্তিই আমাদের শক্তি।'

প্রাণ খুশী হইল। সে-ই সকলের বড়—এত দিনে সকলে বুঝিতে পারিল।

(ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে)

সে এক ঘোবঘুট্টি বন—আড়ে পাঁচ যোজন তো দীর্ঘে তিবিশ যোজন। তাহাব মধ্যে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। গাছে-গাছে ডাল-পালায় পাতায়-পাতায় অন্ধকাব। যেন বাতাসও গলিতে পারে না। গাছের ডালে ঝাপ্টা দিয়ে বাতাস যত বলে, সর সর,—সর সব সাবাক্ষণ গাছের পাতাগুলো ততই বলে মর মব—মর মর। এ ঘোবঘুট্টি বন ছিল এক যক্ষিণীর রাজত্ব—মুখটা ছিল তাহার ঘোড়াব মতন বিশ্রী। এই বনের বুক চিরিয়া দূরের রাজপুরীর দিকে একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সে পথ দিয়া যত লোক আসিত যাইত—ঘোড়ামুখী যক্ষিণী তাহাদের সব ধরিয়া খাইত। এই বনের এক পাশে ছিল মস্ত একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের এক গুহায় ছিল যক্ষিণীর আস্তানা। তাহার আস্তানার সামনে নরকঙ্কালের আবও একটা ছোট পাহাড়—তাহাতে যে কত মানুষের হাড়গোড় আছে তাহার লেখাজোখা নাই।

একদা এক ধনবান সুদর্শন ব্রাহ্মণ অনেক লোকলস্কর সঙ্গে করিয়া ওই পথে আসিতেছিলেন। যেমনি তাহাকে দেখা, অমনি যক্ষিণী হা-হা করিয়া বিকট শব্দে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসল। এক-এক যোজন এক-এক পলকে পার। ব্রাহ্মণের লোকলস্কর প্রাণভয়ে কে কোথায় ছুটিয়া পলাইল। ব্রাহ্মণই শুধু যক্ষিণীর হাতে ধরা পড়িয়া গেলেন। যক্ষিণী তাহাকে পিঠে করিয়া নিজের গুহায় আনিল।

আনিল বটে কিন্তু খাইল না। ব্রাহ্মণকে যক্ষিণী বিবাহ করিল। সেদিন হইতে যক্ষিণীব মন কেমন বদলাইয়া গেল। সেদিন হইতে যত মানুষ সে ধরিয়া আনিত, তাহাদেব চাল-ডাল কাপড়-চোপড় যাহা থাকিত তাহা দিয়া ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সুখে রাখিবার চেষ্টা করিত—আর নিজে মানুষগুলোকে খাইত। যখন সে মানুষ ধরিতে বাহির হইত, তখনই শুধু গুহার মুখে বড় একখানা পাথর চাপা দিয়া যাইত—পাছে ব্রাহ্মণ পলাইয়া যায়।

এমনি ভাবে ব্রাহ্মণ আর যক্ষিণী ওই পাহাড়ের গুহায় কাল কাটাইতে লাগিল। তারপর অনেক দিন পরে বোধিসত্ত্ব তাঁহার এক পূর্বজন্মে তাহাদের ছেলে হইয়া জন্মিলেন। ছেলের চাঁদমুখ দেখিয়া যক্ষিণীর আনন্দ আর ধরে না। তাহাকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, কত আদর করে। এদিকে নানা ভাবে ব্রাহ্মণেরও

সে সেবা করে। কিন্তু গুহার বাহিরে যখন মানুষ ধরিতে যায়, তখন গুহার মুখে সেই বড় পাথরখানা চাপা দিয়া যায়।

দিনে দিনে বোধিসত্ত্ব বড় হইলেন। তাঁহার জ্ঞান আক্কেল বাড়িল ধীরে ধীরে—গায়ে হইল অসীম জোর। একদিন তিনি

গুহার মুখের পাথরখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। তারপর বাপের সঙ্গে গুহার বাহিরে কিছুক্ষণ ঘুরাফিরা করিলেন।

যক্ষিণী ফিরিয়া আসিয়া শুধাইল, 'পাথর সরাল কে?'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'আমি সরিয়েছি মা।'

ছেলেকে যক্ষিণী বড় ভালবাসিত—তাই সেদিন আর সে কিছু বলিল না।

ইহার পর বোধিসত্ত্ব একদিন বাপকে শুধাইলেন, 'আচ্ছা বাবা, তোমাকে দেখতে এক রকম—মাকে দেখতে আর এক রকম। কেন বাবা?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোর মা যক্ষিণী—রাক্ষসী, মানুষ খায়। তার চেহারা তাই ওই রকম। আর আমরা হলাম দু'জনে মানুষ।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তাহলে আমরা এখানে থাকবো কেন? চলো বাবা, যেখানে মানুষ থাকে সেখানে আমরা পালাই।'

শুনিয়া ভয়ে ব্রাহ্মণের বুক কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন, 'আমরা যদি পালাবার চেষ্টা করি তাহলে তোর মা আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তোমার কোনো ভয় নেই বাবা। তুমি ভেবো না। তোমাকে লোকালয়ে নিয়ে যাবার ভার আমার উপর রইল।'

পরের দিন যক্ষিণী যখন বাহিরে গেল তখন বোধিসত্ত্ব বাপকে সঙ্গে করিয়া পলায়ন করিলেন। দুরন্ত বন—কোনও দিকে মানুষ-জনের ঘর-বসতি জানা নাই। বোধিসত্ত্ব ছুটিলেন আগে আগে। মানুষের সমাজে মানুষ ফিরিবে—তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। বনের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিলেন তাঁহারা—এক দিন—দুই দিন—তিন দিন।...যোজন যোজন বন যে আর শেষ হয় না।

এদিকে যক্ষিণী নিজের গুহায় ফিরিয়া দেখিল—কোথায় ছেলে, কোথায় স্বামী! গুহা শূন্য। কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে যক্ষিণী ছুটিল বায়ুবেগে। পলকে যোজন পার। এক জায়গায় গিয়া ধরিয়া ফেলিল ছেলে আর স্বামীকে! ব্রাহ্মণকে বলিল, 'কেন পালাচ্ছ তুমি? তোমার কিসের অভাব বল।'

ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'আমাকে কিছু ব'লো না—দোহাই। তোমার ছেলেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

সেদিনও যক্ষিণী ছেলেকে বড় ভালবাসিত বলিয়া কিছুই বলিল না। দুজনকেই অনেক রকমে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিজের গুহায় আবার ফিরাইয়া আনিল।

বোধিসত্ত্ব এবার নূতন ফন্দি আঁটিতে লাগিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন—মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবেন, তাহার রাজত্বের সীমা কত দূর। একবার সেই সীমার বাহিরে যাইতে পারিলে আর তাহাদের পায় কে!

একদিন তিনি মাকে বলিলেন, 'আচ্ছা মা, তোমার রাজ্য তো আমিই পাব।'

যক্ষিণী বলিল, 'পাবি বই-কি বাবা, আমার আর কে আছে।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তবে বলো—তোমার রাজ্যের সীমা কতখানি।'

যক্ষিণী ছেলের মতলব না বুঝিয়া সব বলিয়া ফেলিল, 'ওই যে একটা পাহাড় দেখা যায়, তার পাশে আছে এক নদী। ওই

নদীর জল পর্যন্ত আমার সীমা। জলে নেমে পড়লে তাকে ধরতেও পারি না—ছুঁতেও পারি না। তবে তার এপাশে আড়ে পাঁচ যোজন আর দীর্ঘে তিরিশ যোজন—এর সব আমার।'

ইহার পর বোধিসত্ত্ব কয়েক দিন চুপচাপ রহিলেন।

এক দিন, দুই দিন করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল। তিন দিন পরে, যক্ষিণী যখন আহারের সন্ধানে বনে বাহির হইয়া গেল তখন বোধিসত্ত্ব আবার বাপকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেই পাহাড় আর নদী লক্ষ্য করিয়া বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিলেন। এত ছুটিয়াও যেন পথের শেষ নাই। কত দূরে—ওগো আরও কত রে সেই পাহাড় আর নদী।

এদিকে যক্ষিণী গুহায় ফিরিয়া দেখিল—গুহা শূন্য। তখন সে-ও পাগলের মত ছুটিতে লাগিল। কোথায় ছেলে—কোথায় স্বামী? যক্ষিণী ডাক পাড়িতে পাড়িতে ঝড়ের বেগে ছুটিতে লাগিল। আর পলকে যোজন পার।

বোধিসত্ত্ব তাহার দিগন্তভেদী ডাক শুনিতে পাইয়া আরও জোরে ছুটিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল—পিছনে যেন একটা ঝড় ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার বুকফাটা কান্নায় যোজন-বিস্তৃত বনভূমি কাঁপিতে লাগিল—আকাশ বুঝি ভাঙিয়া পড়িল।

যক্ষিণী যখন সেই পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বোধিসত্ত্ব জলে নামিয়া পড়িয়াছেন—ব্রাহ্মণও মরি-বাঁচি করিয়া সাঁতার কাটিতেছেন।

রাজ্যের সীমানার বাইরে যক্ষিণীর আর হাত নাই। সে তখন নদীর ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছেলেকে ডাকিতে লাগিল, 'বাছা উঠে আয়। ফিয়ে আয় তোর বাপকে নিয়ে। আমি তোদের কোন্ কাজটা করি না বল্। ফিরে আয়—ফিরে আয়।'

স্বামীপুত্রকে সে বার বার ডাকিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সাঁতার দিয়া ওপারে গিয়া উঠিলেন। যক্ষিণী তখন ছেলেকেই ডাকিতে লাগিল, 'এমন কাজ করিস না বাছা—তুই ফিরে আয়।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মা আমরা মানুষ—তুমি যক্ষিণী। তাই চিরকাল তোমার কাছে আমরা কেমন ক'রে থাকবো?'

'তবে ফিরবি না বাছা?' যক্ষিণী কাঁদিয়া ফেলিল।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'না।'

যক্ষিণী বলিল, 'ওরে বাছা—মানুষের মধ্যে বাস করতে হলে বড় দুঃখ—বড় কষ্ট পেতে হয়।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'তবু সেই ভালো। আমরা মানুষ।'

যক্ষিণী বলিল, 'সেখানে যারা কোন বিদ্যে জানে না, তারা তিষ্ঠোতে পারে না। যদি একান্তই যাবি—তবে তোকে একটা বিদ্যে শিখিয়ে দিই—শিখে যা।'

বোধিসত্ত্ব জলের মধ্যে থাকিয়াই বলিল, 'বলো।'

যক্ষিণী একটা মন্ত্র শিখাইয়া দিল। মন্ত্রের নাম চিন্তামণি বিদ্যা। বলিল, 'এই বিদ্যের বলে বারো বছর আগেও যে লোক চলে গেছে তার পায়ের চিহ্ন দেখতে পাবি। মানুষের মাঝখানে তুই এ বিদ্যে ভাঙিয়েই খেতে-পরতে পাবি।'

বোধিসত্ত্ব বিদ্যা গ্রহণ করিয়া দূর হইতেই মাকে জোড় হাতে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, 'এবার তবে যাই মা।'...

যক্ষিণী ডাক পাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'ওরে, তোরা না থাকলে আমি বাঁচবো না—আমি বাঁচবো না।'...

এই বলিয়া যক্ষিণী সজোরে বুক চাপড়াইতে লাগিল। পুত্র-শোকে বুক ফাটিয়া সে সেখানেই পড়িয়া গেল, আর উঠিল না।

মায়ের মৃত্যু দেখিয়া বোধিসত্ত্ব থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ওপার হইতে বাপকে ডাকিলেন। তারপর দুইজনে যক্ষিণার মৃতদেহ সংকার করিয়া নদী পার হইয়া চলিলেন বারাণসীর দিকে।

বারাণসীতে আসিয়া বোধিসত্ত্ব বারাণসী-রাজের কাছে খবর পাঠাইলেন—একজন পদচিহ্নকুশলী আসিয়াছে।

রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রাজসভায় ঢুকিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করিলেন।

রাজা শুধাইলেন, 'তুমি কি বিদ্যে জান?'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, বারো বছর আগেও যে জিনিস চুরি গেছে—চোরের পদাঙ্ক দেখে তা আমি বার ক'রে দিতে পারি।'

'বেশ'। রাজা বলিলেন, 'আজ থেকে তবে তুমি আমার কাজে বহাল হলে।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'কিন্তু মহারাজ, আমার বেতন রোজ হাজার টাকা।'

রাজা বলিলেন, 'আচ্ছা, তাই তুমি পাবে।'

রাজার আদেশে রোজ তাঁহাকে হাজার টাকা বেতন দেওয়া হইতে লাগিল।

ইহা রাজপুরোহিতের ভাল লাগিল না। কে না কে—কি তাহার বিদ্যা, কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল!

একদিন রাজপুরোহিত রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ,

লোকটির বিদ্যের পরীক্ষা করা হোক। সত্যিই ও কোন বিদ্যে জানে কিনা কে জানে!'

রাজা বলিলেন, 'বেশ পরীক্ষা হোক।'

তখন দুই জনে অনেক সলাপবামর্শ করিয়া রাজ-ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য মণিমানিক লইযা প্রাসাদ হইতে নামিলেন। সোজা পথে নামিলেন না—নামিলেন অনেক ঘুরপাক খাইযা। অন্ধকারে তিনবার রাজপ্রাসাদ বেড় দিলেন, তারপর পাঁচিলে উঠিলেন। সেখান হইতে মই ফেলিযা নীচে নামিলেন। আবার উঠিলেন, আবার নামিলেন। তারপর রাজপুরীর মধ্যে যে সরোবর আছে তাহার চারিপাশে তিনবার ঘুরিলেন। শেষকালে মণিমানিকের পেটিটি সরোবরের মাঝখানে পুঁতিয়া রাখিলেন। তারপর যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন সকালবেলা সোরগোল পড়িয়া গেল—রাজ-ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য মণিমানিক সব চুরি গিযাছে। রাজপ্রাসাদ তোলপাড়—রাজপুরী তোলপাড়। রাজ্যের লোক 'হায় হায়' করিতে লাগিল।

রাজা যেন কিছুই জানেন না—এই ভাবে বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রাজভবন থেকে বহু রত্ন চুরি গেছে। এখন তোমার বিদ্যার গুণ দেখাও।'

'যে আজ্ঞা মহারাজ,' বলিয়া বোধিসত্ত্ব নির্জনে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করিতেই বহু

ঘুরপাক-খাওয়া পায়ের দাগ দেখিতে পাইলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বলিলেন, 'মহারাজ, দুজন চোরের পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি।'

রাজা বলিলেন, 'চোর ধর।'

রাতের বেলা রাজা আর রাজপুরোহিত যেমন যেমন ঘুরপাক খাইয়াছিলেন, বোধিসত্ত্ব সেইভাবে তাঁহাদের পায়ের দাগ দেখিয়া দেখিয়া চলিলেন। শেষ পর্যন্ত সরোবরের মাঝখান হইতে রত্নের পেটি উদ্ধার করিয়া আনিয়া দিলেন।

ব্যাপার দেখিবার জন্য তখন রাজ্যসুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বোধিসত্ত্বের বাহাদুরি দেখিয়া সকলে হাততালি দিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল—কে জানে, এ লোকটা রাত্রির ব্যাপার হয়তো সবই দেখিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন, 'রত্ন তো পাওয়া গেল—এখন চোর ধরে দাও দেখি।'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, চোর বড় পদস্থ। সে চোর না ধরাই ভালো।'

রাজা বলিলেন, 'কেন?'

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, 'মহারাজ, রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তো নিস্তার নেই। চোর সেই রক্ষক।'

রাজা বলিলেন, 'তোমার ঠারে ঠুরে অত কথা বুঝি না। তুমি তোমার বিদ্যের জোরে হাতে-নাতে চোরটি ধরে দাও। ব্যাস্।'

ওদিকে রাজ্যের লোকও তখন সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল, 'দাও—চোর ধরে দাও। চোরকে আমরা শাস্তি দেবো।'

বোধিসত্ত্ব রাজাকে বাঁচাইবার জন্য বলিলেন, 'ঠারে ঠুরে আবার বলছি মহারাজ, যিনি সকলের ধন রক্ষার কর্তা—চোর তিনিই। এর বেশী আর জানতে চাইবেন না।'

রাজা বলিলেন, 'বাপু, আমি তোমার ঠার-ঠুর বুঝি না। হয় চোর ধরে দাও—নয় বুঝবো, তুমিই চোর। তুমিই চুরি করে সরোবরের মাঝখানে ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলে।'

রাজার কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ জনতা বোধিসত্ত্বের দিকে চাহিয়া গর্জন কবিয়া উঠিল।

বোধিসত্ত্বও রাজার অপমানকর কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, 'তবে মহারাজ একান্তই চোর ধরতে চান্?'

রাজা বলিলেন, 'চাই বই-কি!'

রাজ্যের লোক একসঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল, 'চাই।'…

বোধিসত্ত্ব রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তবে আমি রাজ্যের সমস্ত প্রজার কাছে চোরের নাম বলি?'

রাজা বলিলেন, 'বলো।'

বোধিসত্ত্ব মনে মনে বলিলেন, 'আমি এই রাজাকে রক্ষা করতে চাইলাম—কিন্তু বুদ্ধির দোষে ইনি তা করতে দিলেন না।' তারপর রাজ্যের সমস্ত লোককে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা তবে শোনো, যারা এতদিন তোমাদের উপকার করতেন এখন তাঁরাই

হয়েছেন তোমাদের ভয়ের কারণ। তোমাদের সম্পত্তিই রাজার সম্পত্তি, রাজা তোমাদের সম্পত্তির রক্ষক মাত্র। এখন সেই রাজা আর তাঁর পুরোহিত মিলে রাজ্য লুট করতে নেমেছেন। রক্ষক আজ ভক্ষক। অতএব তোমরা এবার আত্মরক্ষা কর।'

শুনিয়া প্রজাসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিল। কি! রাজা নিজে চুরি করিয়া অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে চান! অতএব ইনি যাহাতে আর এরকম চুরি না করেন তাহার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। 'মার এই পাপিষ্ঠ রাজাকে'—এই বলিয়া সকলে রাজা ও রাজ-পুরোহিতকে লাঠি ঢিল মুগুর—হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। মারের চোটে রাজা ও রাজপুরোহিত সেইখানেই মারা গেলেন। তারপর প্রজারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে বরণ করিয়া লইল।

(জাতক হইতে)

আত্মোৎসর্গ

হিমালয় পর্বতের এক অঞ্চলে বিদ্যাধররা বসবাস করিত। বিদ্যাধররা ছিল দেবতাদেরই স্বগোত্র। এই বিদ্যাধরদের রাজা ছিলেন জীমূতকেতু। জীমূতকেতুর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না—তাই তাঁর মনে বড় দুঃখ। তাঁহার এত ধনদৌলত রাজ্যশ্রী কে ভোগ করিবে?

জীমূতকেতুর বাগানে ছিল একটি কল্পবৃক্ষ। এই কল্পবৃক্ষের কাছে যে যাহা চাহিত তাহাই পাইত। মনের দুঃখে জীমূতকেতু একদিন কল্পবৃক্ষের কাছে গিয়া নিজের বেদনার কথা বলিলেন। রাজা বলিলেন, 'হে কল্পবৃক্ষ, একটি গুণবান পুত্র দিয়া আমার দুঃখ দূর কর।'

কল্পবৃক্ষ বলিল, 'রাজা, আপনার বিখ্যাত দানবীর দয়াশীল একটি ছেলে জন্মাবে—আপনি ভাববেন না।'

জীমূতকেতু খুশী হইয়া ঘরে ফিরিলেন।

কল্পবৃক্ষের কথা মিথ্যা হইবার নয়। রাজা জীমূতকেতুর একটি ছেলে হইল—তাহার নাম রাখা হইল জীমূতবাহন। সে যত বড় হইতে লাগিল ততই তাহার গুণরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর একদিন জীমূতবাহন যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইল। হইল বটে, কিন্তু রাজকুমারের রাজ্যপাটে মন নাই। একদিন সে জীমূতকেতুর কাছে গিয়া বলিল, 'বাবা, আমি এই কথাটা ভাল করে বুঝেছি যে, এ সংসারে সব কিছুই অসার। সার শুধু মহাত্মাদের খ্যাতি। সেই খ্যাতিই চিরকাল টিকে থাকে। তাই, পরের উপকার ক'রে আমি যাতে যশ লাভ করতে পারি—তারই চেষ্টা করতে চাই।'

রাজকুমারের ঠিক মতলবটি বুঝিতে না পারিয়া রাজা জীমূতকেতু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজকুমার বলিল, 'আমাদের বাগানে একটি কল্পবৃক্ষ আছে—গরীবদের উপকারে তাকে যদি লাগাতে পারি তাতে আমাদের খ্যাতি চিরকাল টিকে থাকবে। আপনার অনুমতি পেলে আমি গরীবদের অভাব মোচনের চেষ্টা করি।'

জীমূতকেতু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'চল—এক্ষুণি গিয়ে আমরা কল্পবৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করি।'

রাজা আর রাজকুমার কল্পবৃক্ষের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জীমূতকেতু বলিলেন, 'হে কল্পবৃক্ষ, তুমি চিরকাল আমাদের কামনাই পূরণ করে এসেছ। নিজেদের জন্তে আমরা আর কিছু

চাই না, আজ থেকে তুমি গরীবদের যত অভাব আছে সব মিটিয়ে দাও। আজ থেকে তুমি গরীবদের।'

সেদিন হইতে কল্পবৃক্ষ অজস্র ধনরত্ন বর্ষণ করিতে লাগিল। এ পৃথিবীতে দরিদ্র আর কেহ রহিল না। সকলের সকল অভাব মিটিয়া গেল। জীমৃতবাহনের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু বিদ্যাধবদের ভিতরে হিংস্থকের অভাব ছিল না। জীমূতবাহনের জয়-জয়কার তাহাদের অসহ্য হইল। কল্পবৃক্ষটি গরীবদের দান করিয়া দেওয়ায় জীমূতবাহন নিশ্চয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছে—এই ভাবিয়া একদিন তাহারা একযোগে জীমূতবাহনের রাজ্য আক্রমণ কবিল।

শত্রুপক্ষের এই অত্যাচাবে জীমতবাহন কিন্তু এতটুকু ভয় পাইল না, এতটুকু বিচলিত হইল না। বরঞ্চ জীমূতকেতুর কাছে গিয়া বলিল, 'বাবা আমাদের এই বাজ্যপাট চিরদিন থাকবে না। এ সবই অস্থায়ী, তাই এর জন্যে মিছামিছি যুদ্ধ ক'রে রক্তপাত ঘটিয়ে লাভ কি! আত্মীয়রাই আজ আমার শত্রু। তাই আমি ভাবছি, ওদেরই হাতে এ রাজ্য দান ক'রে আমি বনে চলে যাই।'

জীমূতকেতু তখন বৃদ্ধ। তাঁহার বিষয়-বাসনা আগেই চুকিয়া গিয়াছে। এখন ছেলের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি যুবক, তোমার এখন ভোগের সময়। কিন্তু তুমিই যদি সব ছেড়ে

চলে যেতে চাও তাহলে আমিই বা আর এখানে পড়ে থাকব কেন? আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও।'

জীমূতবাহনের মা-ও বলিলেন, 'আমাকেও সঙ্গে নাও।'

জীমূতবাহন তখন বাপ-মাকে সঙ্গে লইয়া মলয় পাহাড়ে চলিয়া গেল—মলয় বাতাস যেখানে চন্দনের বনে চন্দনের গন্ধ ছড়াইতেছে, সব সময়ে ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া। সেখানে এক আশ্রম তৈয়ারি করিয়া জীমূতবাহন বাপ-মায়ের সঙ্গে সুখে কাল কাটাইতে লাগিল

তারপর হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জীমূতবাহন একদিন পাহাড়ের এক প্রান্তে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখিল—একটি মেয়ে খুব কাঁদিতেছে আর একটি যুবক তাহাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতেছে। জীমূতবাহন তাহাদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে? কি হয়েছে তোমাদের?'

যুবকটি বলিল, 'আমরা নাগবংশের। আমার নাম শঙ্খচূড়। আর যিনি কাঁদছেন উনি আমার মা।'

জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন—উনি কাঁদছেন কেন?'

যুবক শঙ্খচূড় বলিল, 'গোলমালটা শুরু হয়েছিল অনেক কাল আগে। কশ্যপ মুনির ছিল দুই স্ত্রী—বিনতা আর কদ্রু। তাঁদের দুজনের ঝগড়া থেকেই শুরু হ'ল একটা বিশ্রী কাণ্ড।'

জীমূতবাহন মন দিয়া শুনিতে লাগিল—শঙ্খচূড় বলিয়া চলিল সেই আদ্যিকালের ঘটনা। ··

একদিন নাগ-মাতা কদ্রুর সঙ্গে গরুড়ের মা বিনতার সামান্য ব্যাপার লইয়া গুরুতর কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। বিনতা বলিলেন—সূর্যের ঘোড়ার রং সাদা। কদ্রু বলিলেন—না, কালো। দুই সতীনে ঝগড়া লাগিয়া গেল। ঝগড়া শেষ হইল এই বলিয়া যে, যার কথা মিথ্যা হইবে তাহাকে অপর জনের কাছে চিরকাল দাসীত্ব করিতে হইবে।

তারপর নাগমাতা কদ্রু একটা ষড়যন্ত্র করিলেন। যাহাতে তাঁহারই জয় হয় এইজন্য নিজের ছেলেদের তিনি গোপনে সূর্যের ঘোড়ার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা ছিল সবাই বিষাক্ত নাগ। তাহারা গিয়া সূর্যের সাদা সাদা ঘোড়াগুলোকে চারদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তাহাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সূর্যের ঘোড়ার রং কালো হইয়া গেল। নাগমাতা কদ্রুর জয় হইল। গরুড়ের মা বিনতা হইলেন তাঁহার দাসী।

ইহার কিছুদিন পরে গরুড় কদ্রুর কাছে জানিতে আসিল—কিসে তাহার মায়ের দাসীত্ব মোচন হইবে। কদ্রুর ছেলেরা বলিল, 'দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে অমৃত পেয়েছেন—যদি সেই অমৃত খেতে পাই তাহলে তোমার মায়ের মুক্তি।'

ইহা শুনিয়া গরুড় চলিল—যেখানে সমুদ্র মন্থন হইতেছে, সেখানে গিয়া সে দেবতাদের সঙ্গে ঘোরতর লড়াই লাগাইয়া দিল। তাহার বীরত্ব দেখিয়া বিষ্ণু খুশী হইয়া তাহাকে বর চাহিতে

বলিলেন। গরুড় বলিল, 'এই বর দিন যাতে নাগেরা আজ থেকে আমার ভক্ষ্য হয়।'

বিষ্ণু বলিলেন, 'তাই হবে।'

আর ইন্দ্র তাঁহাকে অমৃতের কলসীটি দিয়া বলিলেন, 'এই কলসীটি তুমি নাগদের কাছে নিয়ে গিয়ে কুশের ওপর রাখবে—আমি যেমন ক'রে পারি অমৃতের কলসী আবার উদ্ধার ক'রে আনব।'

তারপর গরুড় অমৃতের কলসী লইয়া হাজির হইল নাগদের কাছে। ইন্দ্রের কথামত কলসীটি কুশগাছের ওপর রাখিয়া গরুড় নাগদের বলিল, 'আগে আমার মায়ের মুক্তি দাও, তারপর অমৃত খাও।'

অমৃতের কলসী দেখিয়া নাগেরা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। বিনতাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল। তারপর শুদ্ধ পবিত্র হইয়া অমৃত খাইবার জন্য সবাই নদীতে স্নান করিতে নামিল। সেই সুযোগে ইন্দ্র অমৃতের কলসীটি লইয়া একেবারে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নাগেরা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল—কলসী তো নাই, পড়িয়া আছে শুধু কুশগাছা। অমৃতের লোভে সাগ্রহে তাহারা সেই কুশগাছাই চাটিতে গেল—যদি অমৃত কিছুটা পাওয়া যায়! আর যেমনি চাটা অমনি কুশের ধারে জিভ চিরিয়া দুখণ্ড। সেই দিন হইতে সাপের জিভ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

কদ্রুর ছেলেরা এইভাবে জব্দ হইল। এদিকে বিষ্ণুর বরে

গরুড় পাতালে গিয়া নাগবংশ ধ্বংস করিতে লাগিল। গোটা বংশটাই লোপ পায় দেখিয়া নাগরাজ বাসুকি একদিন গরুড়কে সন্ধির জন্য ডাকিলেন। বলিলেন, 'তোমাকে আর পাতালে আসতে হবে না। সমুদ্রের ধারে তোমার জন্য একজন ক'রে নাগকে পাঠিয়ে দেব।' সেইদিন হইতে গরুড়ের জন্য নাগরাজ বাসুকি রোজ একটি করিয়া নাগ এইখানে পাঠাইয়া দেন।...

গল্প শেষ করিয়া শঙ্খচূড় বলিল, 'সেই থেকে এই নিয়ম আজও চলছে। আজ পড়েছে আমার পালা। তাই আমার মা কাঁদছেন।'

শঙ্খচূড়ের কথা শুনিয়া জীমূতবাহন বিচলিত হইল। বলিল, 'সে কী! বাসুকি কি রকম রাজা হে? প্রজাদের প্রাণ নষ্ট করার আগে তিনি নিজের প্রাণ দিলেন না কেন? কশ্যপ মুনির ছেলে হয়ে গরুড়েরই বা এ কী রকম আচরণ। যাই হোক, শঙ্খচূড়—তোমার কোন ভয় নেই। আজ আমি নিজের দেহ দান ক'রে তোমাকে বাঁচাব।'

শঙ্খচূড় বলিল, 'দোহাই আপনার! আমি একজন সামান্য লোক। আমার জন্য আপনার মহামূল্য জীবন নষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, আমিও সত্য ভ্রষ্ট হতে চাই না। সত্য রক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত বহু নাগ মারা গেছে—আমিও আজ মরব। আপনি বাধা দেবেন না।'

তারপর গরুড়ের আসার সময় হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া

শঙ্খচূড় তাড়াতাড়ি অদূরের এক শিব মন্দিরের দিকে শেষ প্রণাম করিতে চলিয়া গেল।

জীমূতবাহন এই সুযোগ ছাড়িল না। গরুড় যেখান হইতে রোজ নাগদের ছোঁ-মারিয়া লইয়া যায়—সেই পাহাড়ের উপরে গিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরেই পাখার ঝাপটা মারিয়া

উড়িয়া আসিল পক্ষিরাজ গরুড় এবং জীমূতবাহনকেই নাগবংশের একজন ভাবিয়া তাহাকে ছোঁ-মারিয়া নিয়া পাহাড়ের চূড়ার উপরে গিয়া বসিল। তারপর গরুড় তাহাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। জীমূতবাহনের কিন্তু কোনো যন্ত্রণাবোধ নাই—মনে বরং আত্মদানের অপূর্ব আনন্দ। জীমূতবাহনের এই অপরূপ জীবন উৎসর্গ দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া গরুড় খাওয়া ফেলিয়া থমকিয়া গেল : কি ব্যাপার!

এদিকে শঙ্খচূড় শিবকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—যেখান হইতে গরুড় রোজ নাগদের ছোঁ-মারিয়া লইয়া যায়, সেখানে আর একজনের রক্তের ধারা বহিতেছে। শঙ্খচূড় 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল—তার সামান্য জীবনের জন্য একজন মহাত্মার জীবন নষ্ট হইতেছে। শঙ্খচূড় ব্যস্ত হইয়া পক্ষিরাজ গরুড়কে খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল—গরুড় জীমূতবাহনকে খাইতে খাইতে থমকিয়া বসিয়া আছে। শঙ্খচূড় তখন দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, 'পক্ষিরাজ, ওঁকে খাবেন না। উনি নাগসন্তান নন। নাগসন্তান আমি। আমার নাম শঙ্খচূড়। আজ আমার পালা। আপনি আমাকেই খাবেন।'

গরুড় অবাক হইয়া জীমূতবাহনকে বলিল, 'আপনি কে—সত্য করে বলুন।'

জীমূতবাহন হাসিয়া বলিল, 'আমি সত্যিই নাগ-সন্তান— আমাকে খেয়ে শেষ করুন।'

শঙ্খচূড় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'না না,—ওঁকে খাবেন না।'

গরুড় খাওয়া বন্ধ করিয়া আবার শুধাইল, 'কে আপনি— বলুন।'

অগত্যা জীমূতবাহন বলিল, 'আমি জীমূতবাহন।'

গরুড় চমকাইয়া উঠিল। বলিল, 'বিদ্যাধরদের সেই খ্যাতনামা ধর্মপ্রাণ রাজা ?' গরুড় তারপর নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিল, 'হায় হায় আমি আজ কি পাপ করলাম। একমাত্র আগুনে পুড়ে মরা ছাড়া এ পাপ থেকে আমার আর উদ্ধার নেই।' এই বলিয়া পক্ষিরাজ গরুড় তখনই আগুনে পুড়িয়া মরার জন্য প্রস্তুত হইল।

জীমূতবাহন বলিল, 'পক্ষিরাজ, তোমার মরবার দরকার নেই। সত্যিই যদি তুমি তোমার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আজ থেকে তুমি আর নাগদের খেয়ো না। আর যদি পার, এতদিন যাদের খেয়েছ তাদের আবার জীবন দান কর। আমার কথা শোন। এই কাজ করলেই তুমি পাপ থেকে মুক্ত হবে।'

গরুড় জীমূতবাহনের কথা শুনিল। মৃত নাগদের বাঁচাইবার জন্য গরুড় স্বর্গে অমৃত আনিতে ছুটিল। অমৃত লইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিল স্বর্গের দুন্দুভি। জীমূতবাহনের

ক্ষতবিক্ষত দেহে অমৃত ছিটাইয়া দিতেই তাহার শরীর আবার আগের মত সুন্দর হইয়া উঠিল। তারপর গরুড় নাগদের কঙ্কালের উপর অমৃত ছিটাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও বাঁচিয়া উঠিল।

জীমূতবাহনের কীর্তি-কথা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন চারিদিক হইতে তাহাকে দেখিবার জন্য সকলে ছুটিয়া আসিল। এমন কি তাহার আত্মীয় শত্রুরাও আজ বাদ পড়িল না -- জীমূতবাহনের অপহৃত রাজ্য তাহারা আবার জীমূত-বাহনকে ফিরাইয়া দিল, সমস্ত বিদ্যাধর আজ মাথা নত করিয়া মহাত্মা জীমূতবাহনের বশ্যতা স্বীকার করিল।

(সরিৎসাগর হইতে)
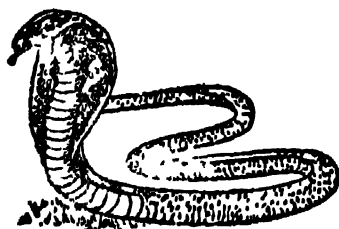
এ কাহিনী বহু যুগ আগের। গোদাবরী নদীর তীরে ছিল এক বিরাট জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মস্ত এক শিমূল গাছে একটি বুদ্ধিমান কাক বাস করিত। কাকটির নাম ছিল লঘুপতনক। যেমন নাম—তেমনি তার কাজ। লঘুপতনক এমন টপ করিয়া নামিয়া আসিয়া ছোঁ-মারিয়া উধাও হইতে পারে যে কেহ টেরও পায় না। একদিন শেষরাতে লঘুপতনকের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাছের আগায় বসিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি ব্যাধ কেমন ভাবে যেন ঘোরাঘুরি করিতেছে। বিপদের ভয়ে সে ব্যাধের পিছনে পিছনে উড়িয়া চলিল। কিছুদূর আসিয়া সে দেখিল, ব্যাধটা এক জায়গায় কিছু চাল ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর ফাঁদ পাতিয়া দিল। দিয়া বনের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ বাদে এক ঝাঁক পায়রা সেই দিক দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মাটিতে ছড়ান চাল দেখিয়া তাহাদের খাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু দলের সর্দার ছিল চিত্রগ্রীব—ভারি সেয়ানা। যেমন তাহার নাম—তেমনি তাহার চেহারা। তাহার গ্রীবা

অর্থাৎ গলার কাছে ময়ূরের মতো ঝিকমিক করে। চিত্রগ্রীব সকলকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিল, 'এখানে আমাদের নামা উচিত হবে না। বিপদ হইতে পারে। ভেবে দেখ একবার, এই জনহীন জঙ্গলে চাল এল কোথা থেকে?'

কিন্তু কে শোনে সে কথা! একটি লোভী পায়রা বলিয়া উঠিল, 'বুড়োদের কথা বিপদে আপদে শোনা উচিত বটে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার সময়েও যদি শুনতে হয় তাহলে খাওয়ার দফা ইতি।'

এই কথা শুনিয়া আরও কটি পায়রা লোভী পায়রাটির সঙ্গে নামিয়া পড়িল। তাহাদের দেখাদেখি সবাই। চিত্রগ্রীব নিরুপায়। শেষ পর্যন্ত গোটা ঝাঁকটা চালের লোভে মাটিতে

নামার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধের জালে ধরা পড়িল। তখন সকলে সেই লোভী পায়রাটির উপর চটিয়া 'মার মার' করিয়া উঠিল। বলিল, 'ওই হতভাগা পাজিটার কথা শুনেই আমরা এই বিপদে পড়লাম।'

চিত্রগ্রীব সকলকে ঠাণ্ডা ক'রয়া ব'লল, 'ওর ওপরে এখন চোট-পাট ক'রে আর লাভ নেই। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। এক কাজ কর—সকলে এক সঙ্গে জাল নিয়ে উড়ে চল।'

চিত্রগ্রীবের উপদেশ মত সকলে এক সঙ্গে চটপট করিয়া জাল লইয়া আকাশে উঠিল। বনের আড়ালে ব্যাধ কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

পায়রারা বলিল, 'সর্দারজী, এখন কি করা উচিত?'

সর্দার চিত্রগ্রীব বলিল, 'জাল নিয়ে উড়ে চল গণ্ডকী নদীর ধারে। সেখানে আমার এক ইঁদুর বন্ধু আছে। তার কাছে গেলে সে আমাদের জাল কেটে মুক্তি দেবে।'

পায়রার দল উড়িয়া চ'লল।

ইঁদুর বন্ধুর নাম হিরণ্যক। তার নামের মানে যেমন সোনা, সে কাজেও তেমনি সোনা। গণ্ডকী নদীর তীরে মস্ত এক গর্তে তার একশ' দুয়ারী ঘর। বিপদ দেখিলেই যে কোন একটা দরজা দিয়া এক নিমেষে হিরণ্যক সুড়ুৎ।

পায়রার ঝাঁকের ডানার ঝটাপট্ শব্দে হিরণ্যক ভয়ে সুড়ুৎ করিয়া গর্তের মধ্যে সরিয়া পড়িল।

চিত্রগ্রীব একশ' দরোজায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল, 'বন্ধু, হে বন্ধু।'—

চিত্রগ্রীবের গলা চিনতে পারিয়া হিরণ্যক বাহির হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল, 'একি কাণ্ড বন্ধু। কি বিপদ?' এই বলিয়া সে দাত তাড়াতাড়ি আগে চিত্রগ্রীবের পায়ের জাল কাটিতে গেল।

'কিন্তু চিত্রগ্রীব বলিল, 'আগে আমার সঙ্গীদের মুক্ত কর।'

হিরণ্যক বলিল 'আমার দাঁতে এত জোর নেই যে জাল কেটে সকলকেই মুক্ত করতে পারব। তাই আগে তোমাকে তো মুক্ত করি।'

চিত্রগ্রীব বলিল, 'উহুঁ, এরা আমার আশ্রয়ে আছে—আগে তাদের মুক্তি দাও ভাই। না হলে অধর্ম হবে।'

হিরণ্যক চিত্রগ্রীবের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, 'বন্ধু তুমি ধন্য। শুধু এই পায়রাদের নয়, তুমি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল—এই তিন লোকের রাজা হওয়ার যোগ্য।' এই বলিয়া হিরণ্যক প্রাণপণে দাঁত দিয়া জাল কাটিয়া সকলকে মুক্ত করিয়া দিল।

পায়রার দল উড়িয়া চলিয়া গেল।

কাক লঘুপতনক পায়রাদের পিছনে পিছনে উড়িয়া আসিয়া একটা গাছে বসিয়া উহাদের সব ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। ইঁদুর হিরণ্যকের কাণ্ড দেখিয়া তাহার খুব ভাল লাগিল। হিরণ্যকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে বলিয়া সে যেমনি ঝুপ্ করিয়া

তাহার গর্তের কাছে নামিল, অমনি ওকেশ' দারোগার এক দারোজা দিয়া হিরণ্যক সুড়ুং।

কাক থাকিয়া ডাকিয়া বলিল, "হিরণ্যক, তুমি বড় ভালো। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাতাবার বড় সাধ।"

হিরণ্যক গর্তের ভিতর হইতে বলিল, 'খুব হয়েছে—সরে পড়ো—তুমি হ'লে কাক, ইঁদুর ধরে ধরে খাওয়াই হলো তোমার স্বভাব। তোমার আর বন্ধুত্ব পাতাতে হবে না।'

মনের দুঃখে কাক বলিল, 'আমাকে অবিশ্বাস করো না। তুমি এক ফোঁটা যে তোমাকে খেয়ে আমার পেট ভরবে না তুমি যেমন চিত্রগ্রীবের বন্ধু, তেমনি আমারও বন্ধু হও।'

হিরণ্যক গর্তের ভিতর হইতে আবার বলিল, 'কাকেরা ভারি চঞ্চল। যারা চঞ্চল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।'

কাক লঘুপতনক বলিল, 'তুমি আমার বন্ধু না হলে তোমার দরোজায় না খেয়েই মরবো—এই শেষ কথা বলে দিলাম। তোমার গুণে আমি মুগ্ধ। তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করবই।'

শেষ পর্যন্ত হিরণ্যক গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল, 'বেশ, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে।'

ইহার পর একদিন কাক বলিল, 'বন্ধু হিরণ্যক, এখানে খাবার জিনিস খুব পাওয়া যায় না। দণ্ডকারণ্যে চল। সেখানে কর্পূরগৌর নামে এক সরোবর আছে। সেই সরোবরে মন্থর নামে আমার এক কচ্ছপ বন্ধু আছে—তার কাছে চল।'

হিরণ্যক রাজি হইলে পর লঘুপতনক তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই দণ্ডকারণ্যে বন্ধু মন্থরের কাছে চলিল। মন্থর নামেও যেমন—কাজেও তেমন, চলেও খুব আস্তে আস্তে। লঘুপতনক কচ্ছপকে ডাকিয়া বলিল, 'মন্থর, ইনি আমার বন্ধু হিরণ্যক—এঁর মত দয়ালু আর দেখিনি।' এই ব'লয়া সে চিত্রগ্রীবের কাহিনী সব ব'লল।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মন্থরও হিরণ্যকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইল।

তারপর তিন বন্ধুতে মিলিয়া সেই সরোবরের তীরে দিব্য সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

ইহার কিছু দিন পরে একটি হরিণ ভয় পাইয়া একদিন সেই সরোবরের তীরে ছুটিয়া আসিল। নাম তার চিত্রাঙ্গ। যেমন নাম তেমন তার চেহারা—সারা গায়ে ছিট্ ছিট্ দাগের চিত্তির-বিচিত্তির। তার পায়ের শব্দে ভয় পাইয়া মন্থর সরোবরের জলে টুব্ করিয়া ডুবিল, হিরণ্যক সুড়ুৎ করিয়া গর্তে ঢুকিল আর লঘুপতনক ফুড়ুৎ করিয়া একেবারে গাছের আগায়। সেখান হইতে সে চারিদিকে নজর ক'রয়া দেখিল। তারপর বন্ধুদের ডাকিয়া বলিল, 'ভয় নেই—তোমরা বেরিয়ে এসো।'

ইঁদুর আর কচ্ছপ দুজনে আবার বাহির হইয়া আসিল। চিত্রাঙ্গ তখনও হাঁপাইতেছিল। কচ্ছপ, তাহাকে নির্ভয় হইতে

বলিয়া—বলিল, 'চিত্রাঙ্গ, তুমিও আমাদের বন্ধু হলে। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাক, দিব্যি ঘাস জল খাও।'

চিত্রাঙ্গ তখন সভয়ে বলিল, 'কলিঙ্গ দেশের রাজা এখানে শিকার করতে এসেছেন। আমি এক ব্যাধের মুখে শুনেছি, রাজা এই সরোবরের তীরে তাঁবু ফেলে থাকবেন। এখন যা ভালো মনে হয় কর।'

এই শুনিয়া কচ্ছপ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'তবে এক্ষুণি এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোন জলাশয়ে পালাই চল।'

কাক আর হরিণ বলিল, 'সেই ভালো, চল।'

হিরণ্যক ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল, 'আর একটা জলাশয় পাওয়া গেলে মন্থরের পক্ষে তো ভালই হয়, কিন্তু ও যাবে কি ক'রে। যেতে যেতে পথেই যদি কোনো বিপদ ঘটে?'

কচ্ছপ কিন্তু সেখানে আর কিছুতেই থাকিতে চাহিল না। অন্য জলাশয়ে যাইবার জন্য আস্তে আস্তে চলিতে শুরু করিল। কাক, ইঁদুর আর হরিণ করে কি! তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু কিছুদূর যাইবার পরই ঘটিল বিপদ। এক ব্যাধ বনের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে কচ্ছপটিকে দেখিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটিয়া গিয়া কচ্ছপকে চাপিয়া ধরিল। তারপর ধনুকের সঙ্গে তাহাকে বেশ করিয়া বাঁধিয়া ঘরের দিকে চলিতে শুরু করিল।

কচ্ছপের এই অবস্থা দেখিয়া ইঁদুর কাঁদিতে কাঁদিতে কাক আর হরিণকে বলিল, 'ভাই, আজ আমাদের বন্ধুত্বের পরীক্ষা। কারণ বিপদেই বুঝা যায় সত্যিকারের বন্ধু কে। এখন যেমন করে হোক—ব্যাধ এই বনের বাইরে যাবার আগে আমাদের বন্ধু মন্থরকে উদ্ধার করতেই হবে।'

কাক আর হরিণ বলিল, 'তুমি বুদ্ধি বাৎলে দাও।

ইঁদুর বলিল, 'তোমরা এক কাজ কর। চিত্রাঙ্গ, তুমি ওই জলের ধারে গিয়ে মড়ার মত পড়ে থাক। আর লঘুপতনক, তুমি চিত্রাঙ্গের গায়ের উপর বসে বসে ঠোকরাও। যেন চিত্রাঙ্গ জল খেতে গিয়ে মরে গেছে।'

হিরণ্যকের বুদ্ধিমত চিত্রাঙ্গ জলের ধারে গিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল। ব্যাধ তো তাহাকে দেখিতে পাইয়া মহা খুশী। হরিণ-মাংসের লোভে সে তাড়াতাড়ি কচ্ছপটিকে জলের ধারে রাখিয়া ছুরি লইয়া হরিণের দিকে কয়েক পা আগাইয়া গেল। যেমনি যাওয়া আর অমনি ইঁদুর হিরণ্যক ছুটিয়া গিয়া কচ্ছপের বাঁধন কাটিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপ জলের ভিতর টুব্। আর ওদিকে ব্যাধকে কাছাকাছি আসতে দেখিয়া কাক লঘুপতনক এক মুহূর্তে ফুড়ুৎ এবং হরিণ চিত্রাঙ্গও এক লাফে ফুড়ুৎ।

ব্যাধটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া বোকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর মনের দুঃখে বন ছাড়িয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

এদিকে কাক, ইঁদুর, কচ্ছপ আর হরিণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া মনের সুখে একসঙ্গে বসবাস করিতে লাগিল। সেদিন হইতে তাহাদের মধ্যে কোনো দিন আর ছাড়াছাড়ি হইল না। কোনো কোনো দিন বন্ধু চিত্রগ্রীবও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া

আসিয়া পড়িত সেই সরোবরের তীরে। তখন পাঁচ বন্ধু আর পায়রার দল মিলিয়া নাচিয়া গাহিয়া যেন আনন্দের মেলা বসাইয়া দিত।

(হিতোপদেশ হইতে)

রাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন মস্ত রাজা। যেমন ছিল তাঁহার রাজ্যপাট—তেমনি ছিল তাঁহার সুবিচার। তাঁহার বিচারে কোথাও এতটুকু অন্যায় হইত না। এইজন্য সারা দেশের লোক 'ধন্য ধন্য' করিত। কিন্তু একদিন এই বিচার শক্তির পরীক্ষা দিতে গিয়া তিনি ভয়ানক বিপদে পড়িলেন।

হঠাৎ একদিন এক কাপালিক সন্ন্যাসী রাজাকে আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, ক্রোশ দুই দূরে একটা শ্মশান আছে, তার পাশে মস্ত এক শিরীষ গাছ। সেই শিরীষ গাছে একটা মড়া ঝোলানো আছে—সেইটে আমাকে এনে দিতে হবে। আমি সাধনা করব।'

সাধু-সন্ন্যাসীর কথা ফেলা যায় না। রাজা বিক্রমাদিত্য চলিলেন শ্মশানের দিকে। অমাবস্যার ঘুটঘুটি অন্ধকার। শ্মশানের চারিদিকে মড়ার মাথা, নরকঙ্কাল, হাড়গোড় ছড়ানো। ভূত-পেত্নীকে রাজা ভয় পাইলেন না। সেই অন্ধকারে খুঁজিয়া

খুঁজিযা শিবাষ গাছ বাহিব কবিলেন—সেখানে দড়িতে ঝোলানো মড়াটিও দেখিতে পাইলেন। বাজা দড়ি হইতে মড়াটিকে খুলিলেন। তাবপব যেমন সেটাকে কাঁধে তুলিতে যাইবেন অমনি সে কথা বলিযা উঠিল। বাজা বুঝিলেন—এই মডাব মধ্যে 'বেতাল' নামে কোনো প্রেত আছে।

সেই বেতাল বলিল, 'মহারাজ, আমাকে নিয়ে যাচ্ছ বটে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন, 'বল।'

বেতাল বলিল, 'আমি একটি-একটি জটিল বিচারের গল্প বলব—তোমাকে তার বিচার করে দিতে হবে। যদি ঠিক উত্তর দাও তাহলে আমি ফের গাছে উঠে যাব, আর যদি ঠিক উত্তর জেনেও না বল তাহলে কিন্তু তোমার বুক চিরে ফেলব।'

রাজা পড়িলেন মহা সমস্যায়। বিচার করিয়া ঠিক উত্তরটি দিলে বেতাল আবার গাছে গিয়া উঠিবে, তাহা হইলে সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর লইয়া যাওয়া হয় না। আর ঠিক ঠিক উত্তরটি না বলিয়া চাপিয়া গেলে বেতাল ভূত বুক চিরিয়া ফেলিবে। রাজা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে বলিলেন, 'বেশ—বলো তোমার গল্প।'

বেতাল রাজাকে পঁচিশটি বিচারের গল্প বলিয়াছিল। তাহার একটি হইল জীয়নমন্ত্রের।

বেতাল জীয়নমন্ত্রের গল্পটি বলিয়া চলিল।…

বিষ্ণুস্বামী নামে একজন খুব ধার্মিক ব্রাহ্মণ জয়স্থল নগরে বসবাস করিতেন। ব্রাহ্মণের ছিল চার ছেলে—চারটিই ভয়ানক পাজী। একটা কেবল পাশা খেলে, বাজি ধরে আর হারে। এই ভাবে সে বাপের অনেক পয়সা নষ্ট করিল। আর একটা একেবারে বাঁদর। তাহার দুর্নামে একেবারে দেশ ভরিয়া গেল।

আর ছুটিও তেমনি। বড় দুই ভাই দাদার স্বভাব দেখিয়া তাহারাও একেবারে বিগড়াইয়া গেল। এই চার মূর্তিমানের জ্বালায় বিষ্ণুস্বামী একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। পাড়ায় আর মুখ দেখাইতে পারেন না। একদিন তিনি চারজনকে একসঙ্গে পাইয়া খুব বকিলেন। বড়জনকে তো বলিয়া দিলেন, 'তোর নাক কান কেটে গাধার পিঠে চাপিয়ে এ দেশ থেকে একেবারে বের করে দেওয়া উচিত।' আর সকলকে বলিলেন, 'তোরা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ। তোদের মরা-বাঁচা দু'ই সমান। আমি তোদের আর মুখ দেখতে চাইনে।'

বিষ্ণুস্বামী চারজনকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

বাপের তাড়া খাইয়া চার ভাইয়ের মনে ভয়ানক ঘৃণা হইল। ভাবিতে লাগিল, তাই তো—জীবনটা তাহাদের বৃথাই গেল।

বড় বলিল, 'হায়, ছেলেবেলায় যদি লেখাপড়া করতাম তাহলে আমাদের অবস্থা আজ এমন হতো না।'

মেজ বলিল, 'এখন কি করা যায়, তাই বলো।'

বড় বলিল, 'এখন বিদেশে গিয়ে আমাদের সকলের কোনও বিদ্যা শেখা উচিত। আর ফাঁকি নয়।'

অন্য তিন ভাই রাজী হইল। তখন চারজনে একসঙ্গে একদিন বিদেশের দিকে রওনা হইয়া পড়িল।

তারপর অনেক দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক গুরু ধরিয়া চার ভাই নিজের পছন্দমত সব বিদ্যা শিক্ষা করিল। কেহ শিখিল

কঙ্কালী বিদ্যা, কেহ বা মাংস-জোড়ানী, কেহ বা চামড়া-জোড়ানী বিদ্যা। একজন শিখিল জ য়নমন্ত্র। এই সব বিদ্যা শেখার পর তাহারা ভাবিল—আর কি, এবার আমাদের মূর্খ নাম ঘুচল। এবার দেশে ফেরা যাক। দেশেব লোককে বিদ্যাব কায়দা দেখাইয়া তাক লাগাই‍া দতে না পা রলে আর 'ক হইল !

চার ভাই এক পথের পথিক—এক মতে মত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিদ্যার জাহাজ হইয়া চাবজনে ত'ল্প-তল্পা বাঁধিয়া, নানান দেশের নানান জিনিস সংগ্রহ কাব‍া একদিন দেশের পথ ধরিল।

ফিরিবার পথে ঘটিল এক কাণ্ড। চাব ভাই এক জায়গায় আসিয়া দেখিতে পাইল—একজন মুচি একটা মরা বাঘের চামড়া ছাড়াইতেছে। চার ভাই একটা গাছের তলায বসিয়া দেখিতে লাগিল। মু'চ বাঘের চামড়া ছাডাইয়া মাংস কাটিতে লাগিল। তারপর মাংস আব চামড়া পোঁটলায় বাঁধিয়া মুচিটি চলিয়া গেল। পড়িয়া রহিল শুধু কিছু হাড়গোড়।

সেই হাড়গোড়গুলির দিকে চাহিয়া এক ভাই বলিল, 'আমি হাড় জোড়া লাগানোর বিদ্যা জানি।'

আর এক ভাই বলিল, 'আমি মাংস জোড়া লাগানোর বিদ্যা জানি।'

আর এক ভাই বলিল, 'আমি চামড়া জোড়া দেওয়ার বিদ্যা জানি।'

আর এক ভাই বলিল, 'আমি জীয়নমন্ত্রে বাঘটাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারি।'

তখন সব ক'টি ভাই বলিয়া উঠিল, 'তবে এসো—আমাদের বিদ্যার পরীক্ষা করা যাক। দেখি একবার—ঠিক ঠিক শেখা হয়েছে কিনা।'

চার ভাই পর পর বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিল। হাড় জোড়া দেওয়া বিদ্যায় বাঘের কঙ্কাল ঠিক হইয়া গেল, মাংস জোড়া দেওয়া বিদ্যায় বাঘের গায়ে মাংস লাগিল, চামড়া জোড়া

দেওয়া বিদ্যায় বাঘের গায়ের চামড়া লাগিয়া গেল। তারপর জীয়নমন্ত্রে বাঘ প্রাণ ফিরিয়া পাইল। প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া বাঘটা 'হালুম' করিয়া একটা লাফ দিল। তারপর চার ভাইকে সেইখানে কড়মড় করিয়া খাইয়া ফেলিল। ·

গল্প বলা শেষ করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, এই চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কে—বলো দেখি?'

রাজা বিক্রমাদিত্য হাসিয়া বলিলেন, 'বোকা সব ক'টাই—আর কিছু পেলে না, বাঘের উপর তাদের বিদ্যে জাহিরের শখ হ'ল। তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা হ'ল ওই ভাইটা—যে জীয়নমন্ত্র দিয়ে বাঘটাকে বাচিয়ে দিলে।'

ঠিক ঠিক উত্তর পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল ভূতের মতো আবার শিরীষ গাছে গিয়া ঝুলিতে লাগিল।

(বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে)

জয়-পরাজয়

পাশাপাশি দুইটি রাজ্য—কোশল আর বারাণসী। কোশলের রাজা ছিলেন দীর্ঘোতি, বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের প্রতাপ বেশী, তাঁর সৈন্য অসংখ্য, হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর যে কত, তার অন্ত নাই। কিন্তু দীর্ঘোতি ছোট রাজা, তাঁর রাজ্য ছোট—সৈন্য-সামন্ত কিছু নাই বলিলেই হয়। তবু দীর্ঘোতির মনটা ছিল বড় ভাল, কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা দীর্ঘোতির পছন্দ হইত না। দীর্ঘোতি বলিতেন, 'হিংসা কখনো জয়ী হয় না; মৈত্রী হিংসা থেকে বড়।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। প্রতাপী রাজা ব্রহ্মদত্ত একদিন দীর্ঘোতির রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিলেন। বেচারা দীর্ঘোতি যুদ্ধে হারিয়া রানীর হাত ধরিয়া পলাইয়া গেলেন। দীর্ঘোতির

রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া আর একটি ছোট রাজ্য—তার নাম কাশী। দীর্ঘোতি রানীকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে কাশীরাজের রাজ্যে পৌঁছিলেন।

কাশীরাজের রাজ্যে এক বুড়ো কুমার বাস করিত। বুড়োর ত্রিসংসারে কেউ নাই। গঙ্গার ধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে বুড়ো থাকে একা একা ;—নিজে রাঁধে, নিজেই খায়, অবসর সময়টায় কয়েকটা হাঁড়িকুড়ি বানাইয়া উনানে শুকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া বাজারে নিয়া বেচিয়া আসে। বুড়ার মনে দুঃখ—হায়, সংসারে যদি আপনার বলিবার আর একটা লোক থাকিত।

এদিকে দীর্ঘোতি আর রানী ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গার পাড়ে বুড়ো কুমারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। তাহাদের রোদে-পোড়া ঘামে-ভেজা সুন্দর মুখ দুইটি দেখিয়া বুড়োর বড় মায়া হইল—হায়, বাছারা কত দুঃখে না জানি এই বয়সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। রানীর দুইটি ছল ছল চোখের দিকে চাহিয়া বুড়া আর কান্না সামলাইতে পারিল না। রাজা রানী বুঝিলেন, এইখানেই কাজ হইবে। তাঁহারা আশ্রয় চাহিলে বুড়া আর না বলিল না।

দেখিতে দেখিতে বছর কাটিয়া গিয়াছে। রাজা দীর্ঘোতি আর রানী কুমার-বুড়ার আশ্রয়ে কাশীরাজ্যে গঙ্গার ধারের কুঁড়ে ঘরটিতে বাস করিতেছেন। এমন সময় রানীর একটি ছেলে হইল। রাজা, রানী আর কুমার-বুড়ার আহ্লাদ আর ধরে না। সকলে মিলিয়া ছেলের নাম রাখিলেন দীর্ঘায়ু।

দীর্ঘায়ু দিন দিন বড় হইতেছে। রাজা রানী ছেলের মুখের পানে চাহিয়া হারানো রাজ্যের দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘায়ু আরও বড় হইল। আর কী সুন্দর হইয়াছে দীর্ঘায়ু! রাজা রানী তাহার দিকে তাকান, আর তাহাদের বুক কাঁপিয়া ওঠে,—কী জানি, যদি ব্রহ্মদত্ত খোঁজ পায়! তাহারা আর ভাবিতে পারে না, দীর্ঘায়ুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। রাজা দীর্ঘায়ুর মাথায় হাত রাখিয়া একদিন বলিলেন, 'দীর্ঘায়ু আমরা কে কবে কার কাছ থেকে দূরে চলে যাব, কে জানে! আমার একটি উপদেশ মনে রেখো—মনে রেখো, হিংসা কখনো জয়ী হয় না, মৈত্রী হিংসা থেকে বড়।' এই কথা কয়টি বলিয়া রাজা বলিলেন, 'তুমি এখনো ছোট, সব কথার অর্থ এখন বুঝতে পারবে না—বড় হলে বুঝবে, তখন সেইভাবে চলো।'

ইহার পর একদিন রাজা রানী দীর্ঘায়ুকে অতি দূরদেশে এক নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেই বা শান্তি কই? এদিকে কে কিভাবে রাজা-রানীর পরিচয় জানিয়া ফেলিয়াছে। কথাটা কাশীরাজের কানে উঠিতে দেরি হইল না। সর্বনাশ মহারাজ ব্রহ্মদত্ত একবার সংবাদ পাইলে কি আর রক্ষা আছে?—কাশীরাজ সাত-পাঁচ ভাবিয়া একেবারে নিজে চর পাঠাইয়া ব্রহ্মদত্তের কাছে খবরটা জানাইয়া দিলেন।

হায়, দীর্ঘেতি! হায়, রানী! হায়, দীর্ঘায়ু!

একদিন লোকজন সৈন্য-সামন্ত লইয়া ব্রহ্মদত্তের সেনাপতি

আসিয়া বুড়া কুমারের কুঁড়ে ঘর হইতে রানী আর দীর্ঘোতিকে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

ব্রহ্মদত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘোতি বলিলেন, 'রাজা, হিংসা কখনো জয়ী হয় না, মৈত্রীই জয়ী হয়।'

কথা শুনিয়া ব্রহ্মদত্ত 'হাঃ হাঃ' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজসভার দেওয়ালগুলি যেন ফাটিয়া চির্ চির্ হইয়া গেল। রাজসভার পাত্র, মিত্র, অমাত্য, পারিষদ সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

দীর্ঘোতি মস্তক উন্নত করিয়া আবার বলিলেন, 'রাজা, আমি সত্যই বলছি, হিংসা কখনো জয়ী হয় না, সংসারের মৈত্রীই জয়ী হয়।'

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত এইবার আর হাসিলেন না। কথা শুনিয়া তাহার ভুরুর লোমগুলি সেই একেবারে সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিল। গোল গোল চোখ দুইটি একেবারে জবাফুলের মত লাল হইয়া গেল। ব্রহ্মদত্ত সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন—তারপর একটু সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া একটু থামিয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না দীর্ঘোতি, তোমার ক্ষমা নেই—তোমার এই দম্ভের শাস্তি প্রাণদণ্ড।'

ব্রহ্মদত্তের কারাগারে রানী আর দীর্ঘোতির এক পক্ষকাল কাটিয়া গেল। আজ চতুর্দশী। আজই প্রহর বেলায় তাঁহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে। তারপর ঘাতকের খড়্গ হতভাগ্য রাজা রানীর মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।

লোকমুখে সংবাদ পাইয়া দূরদেশ হইতে দীর্ঘায়ু মা-বাপকে দেখিতে আসিয়াছে। দীর্ঘায়ুর পরনে ছদ্মবেশ, রাজপুত্র বলিয়া চেনা যায় না। কারাগার হইতে বধ্যভূমিতে যাইবার পথে অসংখ্য লোকের ভিড়, রাজপথের দুই ধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে।—শৃঙ্খলিত দীর্ঘোতি পা-পা করিয়া বধ্যভূমির দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন—ঠিক পিছনে রানী, তাঁহারও দুইটি রাঙা হাতে শিকল পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগে সান্ত্রী—পিছে সান্ত্রী। পথের দুই ধারের লোক ব্রহ্মদত্তের প্রতাপে কাঁদিতেও পারে না।

দীর্ঘোতি আর রানী মাথা উঁচু করিয়া আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু এ কী! দীর্ঘায়ু না? তাইত? রাজা পথের পাশে ভিড়ের মধ্যে একেবারে সামনেই দীর্ঘায়ুকে দেখিতে পাইলেন। রাজার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল, কিন্তু কাঁদিবার উপায় নাই, কাঁদিলে দীর্ঘায়ুও মরিবে। দীর্ঘায়ুর দিকে চাহিয়া রাজা দীর্ঘোতি এবার শান্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, 'হিংসা কখনো জয়ী হয় না, সংসারে মৈত্রীই জয়ী হয়।'

মন্ত্রের মত গম্ভীর তাঁহার কণ্ঠস্বর। নাগরিকেরা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু এই কণ্ঠস্বর তাহাদের প্রাণের ভিতর গিয়া পৌঁছিল।

রানী রাজা দীর্ঘোতির পিছনে পিছনে চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে একবার তিনিও দীর্ঘায়ুর কাছে আসিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘায়ুর বুক ফাটিযা যাইতেছিল, মনে হইতেছিল, একবাব 'মা মা' বলিয়া চীৎকাব কবিযা ওঠে, শুধু একবাব। তাবপব ব্রহ্মদত্ত চিনিযা ফেলিলে না হয মববে। কিন্তু বানীব শান্ত স্নিগ্ধ করুণা-মাখা চোখ দুটিব দিকে চাহিযা দীঘাযুব মন যেন শান্ত হইয়া গেল। দীর্ঘায়ু মনে মনে বাব বাব বলিতে লাগিল, 'মা মা মা। মা মা মা।' বানী হাসিযা দীর্ঘাযুব দিকে চাহিযা ধীবে ধীবে বলিলেন, 'জীবনে হিংসা কখনো জযী হয না, মৈত্রীই জয়ী হয।'

রানীর কণ্ঠে যেন বীণা বা যা উঠল দীর্ঘাযুর মন তখন একটু শান্ত হইযাছে। বাজা বানী দীঘাযুকে অতিক্রম কবিযা চলিযা গেলেন। এইবাব দীঘাযুব চোখ দিযা ঝব ঝব কবিযা জল নামিযা আসিল।

দিন যায়। বছবেব পব বছর কাটিযা গেল। দীর্ঘাযু এখন অনেক বড় হইযাছে। কি জানি, কি খেযাল হইল—দীর্ঘাযু আসিযা বাবাণসীতে উপস্থিত। বাজা ব্রহ্মদত্ত তখনও অমিত-বিক্রমে বাজত্ব চালাইতেছেন। দীঘাযু ব্রহ্মদত্তেব হাতীশালায একটা কাজ জুটাইযা লইল। দীর্ঘাযুকে কেহ চিনিল না, আব এত দিন পর্যন্ত সেইসব কথা কে-ই বা মনে বাখিযাছে?

হাতীশালায বসিযা বসিযা দীর্ঘাযুব সময় কাটিযা যায। বাজার বড পাগলা হাতীটা দীর্ঘাযুব খুব পোষ মানিযাছে। বাজা খুব খুশী—আব দীর্ঘাযুও হাতীগুলিব খুব যত্ন কবে। আব এক

কথা, দীর্ঘায়ু খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল। হাতীশালের পাশে বসিয়া দীর্ঘায়ু যখন বাঁশী বাজাইত, তখন পাগলা হাতীটা শুঁড় উপরে তুলিয়া নাচাইত, কী আনন্দ হাতীটার! তারপর দীর্ঘায়ু বাঁশীটা হাতে নিয়া হাতীর দুইটি বড় বড় দাঁতের উপর পা দিয়া যখন একেবারে তাহার পিঠে উঠিয়া বসিত, আর বাঁশী বাজাইত, তখন হাতীটা আরও খুশী—তাহার আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। মাতালের মত টলিতে টলিতে শুঁড় উপরে তুলিয়া দীর্ঘায়ুকে পিঠে নিয়া সে আনন্দে ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইত।

কিছু দিন পরে। একদিন রাজা মৃগয়ায় যাইবেন। শখ হইয়াছে, পাগলা হাতীটাতেই চড়িয়া যাইবেন। তাই ডাক পড়িল দীর্ঘায়ুর—দীর্ঘায়ুকে সঙ্গে যাইতে হইবে। লোক লস্কর আর দীর্ঘায়ুকে লইয়া রাজা গভীর বনে ঢুকিলেন। পাগলা হাতীর গোঁ, তার উপর দীর্ঘায়ুকে সঙ্গে পাইয়া সে খুশী—হাতীও ছুটিতে ছুটিতে লোকজন পিছনে ফেলিয়া বহুদূর আগাইয়া গেল। ব্রহ্মদত্ত বড় ক্লান্ত হইয়াছেন। হাতী হইতে নামিয়া একটা বড় গাছের সঙ্গে হাতী বাঁধিয়া রাজা দীর্ঘায়ুর কোলে মাথা রাখিয়া সেই গাছের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিবিড় নিস্তব্ধ বন। চারিদিক ঝিম ঝিম করিতেছে, কোথাও জনপ্রাণী নাই, এক আধটা পাখীও ডাকে না। রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘায়ু ভাবিল, 'এ-ই সময়, এখনই পিতৃহত্যার

প্রতিশোধ নেব।' দীর্ঘায়ু রাজার মাথা ধীরে ধীরে গাছের গুঁড়ির উপর নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর চকিতে কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া রাজার দেহে আঘাত করিতে যাইতেই তাহার মনে পড়িয়া গেল—'হিংসা কখনো জয়ী হয় না, মৈত্রীই সংসারে জয়ী হয়।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল তাহার মায়ের শান্ত স্নিগ্ধ মুখখানি—মাকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, আর মা বীণার ধ্বনির মত অপূর্ব মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ

করিতে করিতে যাইতেছেন—'হিংসা কখনো জয়ী হয় না, মৈত্রীই জয়ী হয়।' পিতার কথাও দীর্ঘায়ুর মনে পড়িয়া গেল, পিতা উন্নত মস্তকে বধ্যভূমির দিকে পা-পা করিয়া আগাইয়া যাইতেছেন—তাঁহার হাতে পায়ে শৃঙ্খলের বাঁধন, সম্মুখে পশ্চাতে শাস্ত্রী। এখনই তাঁহার প্রাণ যাইবে, কিন্তু কী শান্ত তাঁহার কণ্ঠস্বর! তিনি মন্ত্রের মত গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, 'হিংসা কখনো জয়ী হয় না, জীবনে মৈত্রীই জয়ী হয়।'

দীর্ঘায়ুর হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া রাজা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখে মুখে এক ভীষণ আতঙ্কের আভাষ;—দীর্ঘায়ু দেখিল, রাজার সকল শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা দীর্ঘায়ুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'দীর্ঘায়ু, এইমাত্র আমি স্বপ্ন দেখলাম, তুমি যেন অসি দিয়ে আমাকে হত্যা করছ। তারপর কে যেন বড় মধুর কণ্ঠে বললে—'হিংসা কখনো জয়ী হয় না, মৈত্রীই সংসারে জয়ী হয়,—অমনি তোমার হাত থেকে অসি খসে পড়ে গেল, আর সেই শব্দে আমি জেগে উঠলাম।'

দীর্ঘায়ু অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল—'মহারাজ, আপনার স্বপ্ন সত্য। আমি সত্যিই আপনাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা মাতা যেন হঠাৎ বলে উঠলেন,—হিংসা কখনো জয়ী হয় না, জীবনে মৈত্রীই জয়ী হয়।—তখনই আমার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল, আপনিও সেই শব্দে জেগে উঠলেন।'

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, 'সত্যিই হিংসা কখনো জয়ী হয় না দীর্ঘায়ু, সংসারে মৈত্রীই একমাত্র সত্য।—কিন্তু এ কথা আমি আগে বুঝি নি—তাই দুটি মহাপ্রাণ একদিন আমার হাতে বিনষ্ট হয়েছে।'

দীর্ঘায়ু তেমনি শান্ত ভাবে আবার বলিল, 'মহারাজ, আমি তাঁদেরই পুত্র, রাজা দীর্ঘোত্তি আমার পিতা।'

ব্রহ্মদত্ত আবিষ্টের মত দীর্ঘায়ুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু নামিয়া আসিল।

(জাতক হইতে)

বিশ্বাসঘাতক

বিশাল নগরীতে এক সময়ে নন্দ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। যেমন ছিল তাঁহার রাজ্যপাট—তেমনি ছিল প্রতাপ। আর বিচারও ছিল বড় কড়া। যিনি কি-না রাজপুরোহিত, রাজার হিত চিন্তাই যাঁহার কাজ, সেই রাজপুরোহিতকেই তিনি একবার সন্দেহ করিয়া বধের আদেশ দিলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'যাও, ওকে মেরে ফেল।'

মন্ত্রী রাজপুরোহিত শারদানন্দকে বধ করিবার জন্য লইয়া চলিল দক্ষিণ মশানে।

শারদানন্দ হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন গুণী বিদ্বান মানুষ—মস্ত পণ্ডিত। কিন্তু হইলে কি হইবে, রাজার কোপের কাছে সব মিথ্যা। শারদানন্দ বলিতে বলিতে চলিলেন, 'হায়, রাজা যার ওপরে চটেন সে নিষ্পাপ হলেও পাপী, পটু হলেও অপটু, বীর হলেও ভীরু, পরমায়ু থাকলেও অপঘাতে মরে।'

তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া মন্ত্রীর প্রাণ গলিল। মন্ত্রী শারদানন্দকে একটা চোরা কুঠুরির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া রাজাকে আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার আদেশে শারদানন্দকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

রাজার রাগ পড়িল।

তারপর যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। রাজ্যের নানা কাজে, আনন্দে, উৎসবে রাজা শারদানন্দের কথা একেবারে ভুলিয়াই গেলেন।

একদিন রাজপুত্র জয়পাল শিকারে বাহির হইলেন। কিন্তু বাহির হইবার সময়ে নানারকম দুর্লক্ষণ সব দেখা গেল। শুরু হইল অকাল বৃষ্টি, উল্কাপতন, বজ্রাঘাত, মড়া-কান্না।

মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিসাগর ছিল রাজপুত্রের খুব বন্ধু। বুদ্ধিসাগর চারিদিকে অমঙ্গল দেখিয়া বলিল, 'রাজপুত্র, শিকারে আজ যাবেন না।'

রাজপুত্র বলিল, 'কেন?'

এই 'কেন'র উত্তর দিতে পারিতেন শারদানন্দ থাকিলে। তিনি ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারিতেন—কি ঘটিবে না ঘটিবে। কিন্তু তিনি নাই—রাজপুত্রকে কেহ ঠেকাইতে পারিল না। রাজপুত্র অনেক লোকলস্কর শিকারী লইয়া শিকারে বাহির হইয়া গেল।

তারপর রাজপুত্র বনে গিয়া অনেক শিকার করিল। তাহাতে মন ভরিল না। একটা কৃষ্ণসার হরিণ দেখিয়া তাহার পিছু ধাওয়া করিল। হরিণ ছুটিল গভীর মহাবনে—ঘোড়া ছুটাইয়া রাজপুত্রও ছুটিল তাহার পিছনে। রাজপুত্র এক সময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—তাহার লোকলস্কর নাই, তাহারা সব নগরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময়ে হরিণটাও কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজপুত্র তখন একা একা ফিরিতে লাগিল। কিছুটা আসিয়াই একটি সরোবর দেখিল। জল খাইবার জন্য রাজপুত্র ঘোড়া হইতে নামিল। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাজপুত্র অঞ্জলি ভরিয়া জল খাইল। তারপর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া একটা গাছের তলায় আসিয়া বসিল।

যেমনি বসা অমনি একটা মস্ত বাঘ হুংকার দিয়া রাজকুমারের সামনে আসিয়া পড়িল। দড়ি ছিঁড়িয়া ঘোড়াটা কোথায় ছুটিয়া পলাইল। রাজকুমারও তাড়াতাড়ি কোনও রকমে একটা গাছে গিয়া উঠিল।

কিন্তু সেখানেও নিস্তার নাই। এই গাছের উপরে আগে হইতেই একটা ভালুক উঠিয়া বসিয়া ছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতেই রাজপুত্রের বুক ধড়াস করিয়া উঠিল।

রাজকুমারের ভয় দেখিয়া ভালুক বলিল, 'রাজপুত্র ভয় করো না। আজ তুমি আমার শরণাগত, তাই তোমার আমি কোনো

অনিষ্ট করব না। ভালো করে গাছে উঠে বসো, বাঘকে ভয় পেও না।'

ভালুকের কথা শুনিয়া রাজপুত্রের ধড়ে প্রাণ আসিল। গাছের উপর ভালো করিয়া সে জাঁকিয়া বসিল।

ওদিকে বাঘটাও গাছের তলা আগলাইয়া বসিয়া রহিল।

তারপর আস্তে আস্তে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল। রাজপুত্রের ভয়ানক ঘুম পাইতে লাগিল। সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া ভয়ানক ক্লান্ত—ঘুম তো পাইবেই। রাজপুত্র ঢুলিতে লাগিল। আর গাছের নীচে বাঘটার জিভ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ভালুক তখন রাজপুত্রকে ডাকিয়া বলিল, 'গাছ থেকে পড়ে যাবে রাজপুত্র! এসো—আমার কোলে এসে ঘুমোও।'

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র ভালুকের কাছে সরিয়া গেল এবং ভালুকের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চোখে নামিল গভীর ঘুম।

তখন গাছের তলা হইতে বাঘ বলিল, 'ওহে ভালুক, এবার রাজপুত্রকে দাও নীচে ফেলে।'

ভালুক বলিল, 'যে শরণাগত, তাকে এমনি ক'রে মেরে ফেললে ভয়ানক পাপ হয়।'

বাঘ বলিল, 'ভালুক, লোকটা আমাদের শত্রু। মানুষের মত খারাপ আর কেউ নেই। ও আবার যেদিন শিকার করতে আসবে সেদিন আমাদের সকলকেই মেরে ফেলবে। কেন তাকে কোলে নিয়ে সারা রাত বসে আছ? তার চেয়ে দাও ওকে টপ্ ক'রে ফেলে—আমিও গপ্ ক'রে খেয়ে চলে যাই।'

ভালুক একভাবে বলিল, 'এ লোকটা যেমনি হোক, শরণাগতকে আমি ছাড়তে পারি না।'

বাঘ আর কি করে, মন খারাপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাছতলা ছাড়িল না।

এদিকে রাজকুমার কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লইবার পর জাগিয়া উঠিল। ভালুক বলিল, 'রাজকুমার, এবার আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, তুমি জেগে থাকো। খবর্দার কারুর কোনো কথা শুনো না।

ভালুক তো ঘুমাইল, রাজপুত্র জাগিয়া রহিল।

বাঘ তখন আবার বলিল, 'ওগো রাজকুমার, তুমি বুদ্ধিমান মানুষ—খবর্দার, ওই ভালুকটাকে বিশ্বাস ক'রো না। ও তোমাকে নখে চিরে ফেলবে। জানই তো শাস্ত্রে আছে—যে সব জন্তুর বড় বড় নখ, তাদের বিশ্বাস করতে নেই। তাই বলছি ভালুকটাকে দাও টপ্ ক'রে ফেলে—আমিও গপ্ ক'রে খাই। তারপর আমি চলে যাই বনে—তুমি চলে যাও নগরে।'

বাঘের কথা রাজপুত্রের মনে ধরিল। কতক্ষণ আর আপদ কোলে করিয়া গাছের উপর বসিয়া থাকা যায়! রাজপুত্র এই ভাবিয়া দিল ভালুককে গাছ হইতে ফেলিয়া।

বেচারী ভালুক! যাই হোক গাছ হইতে পড়িতে পড়িতে কোনো রকমে সে একটা গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিল। তারপর অকৃতজ্ঞ রাজপুত্রের দিকে চাহিয়া রাগে তাহার সর্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল। রাজপুত্র তাহার ভয়ংকর মূর্তি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

ভালুক বলিল, 'কি পাপিষ্ঠ, এখন ভয় পাচ্ছ কেন! যাও, আজ থেকে তুমি স-সে-মি রা এই কথা বলে পিশাচ হয়ে ঘুরে বেড়াবে।'

ভালুকের অভিশাপে রাজপুত্র পিশাচ হইয়া গেল এবং স-সে-মি-রা এই কথা বলিতে বলিতে সারা বন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাদ্যখাদ্যে বিচার নাই—একটা বর্বর পাগল।

ওদিকে রাজপুরীতে হুলস্থূল। শিকার হইতে সবাই ফিরিল কিন্তু রাজপুত্র তো ফিরে নাই। রাজা ভাবিতে বসিলেন, মন্ত্রী ভাবিতে বসিলেন—রানী কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর একদিন বহু লোকলস্কর, সিপাইশাস্ত্রী, হাতীঘোড়া লইয়া রাজা আর মন্ত্রী সেই বনে আসিলেন রাজপুত্রকে খুঁজিতে। খোঁজাখুঁজি আর কি, রাজপুত্রকে সহজেই পাওয়া গেল। সে তখন পিশাচ হইয়া

ঘুরিতেছে আর মুখে এক কথা—যার মাথা নাই, মুণ্ডু নাই 'স-সে-মি-রা···স-সে-মি-রা'।—

যাই হোক, রাজপুত্রকে কোনো রকমে রাজপুরীতে ফিরাইয়া, আনা হইল। তারপর কত বদ্যি কত ওষুধ দিল, কত তুক্‌তাক্ করা হইল, রাজপুত্র সারিল না। মুখে তার এক কথা—'স-সে-মি-রা'।

রাজা একদিন দুঃখ করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, 'হায়, এমন দুর্দিনে যদি শারদানন্দ থাকত, তাহলে রাজকুমারকে এক মুহূর্তে সারিয়ে দিতো।'

শুনিয়া মন্ত্রীর মনে আনন্দ হইল কিন্তু কিছু বলিলেন না। কে জানে শারদানন্দকে মন্ত্রী বাঁচাইয়া রাখিয়াছে শুনিলে রাজা আবার হয়ত মন্ত্রীর উপরেই চটিয়া যায়। মন্ত্রী তাই চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন, 'যাক, শারদানন্দ যখন নেই আর কি করা যাবে। এখন রাজ্যে ঘোষণা করে দাও—যে আমার ছেলেকে ভালো ক'রে দেবে তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেবো।'

রাজার কাছ হইতে বিদায় লইয়া মন্ত্রী সোজা ঘরে ফিরিলেন। শারদানন্দকে রাজার সব কথা বলিলেন।

শারদানন্দ বলিলেন, 'আপনি এক কাজ করুন। রাজাকে গিয়ে বলুন যে, আপনার মেয়ে মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানে—সে পর্দার

আড়াল থেকে রাজকুমারকে একবার দেখবে—সারানো যায় কি না।'

মন্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, 'তারপর ?'

শারদানন্দ বলিলেন, 'পর্দার আড়ালে আমি থাকবো। রাজকুমারকে কেমন ক'রে সারানো যায়—সে আমি দেখবো !'

শারদানন্দের পরামর্শ মত মন্ত্রী রাজাকে গিয়া সব বলিলেন। তখন রাজা তাঁহার পাত্রমিত্রদের লইয়া রাজপুত্রকে সঙ্গে করিয়া মন্ত্রীর বাড়ীতে আসিলেন। যেন মন্ত্রীর বাড়ীতে রাজসভা বসিয়া গেল। সকলের মাঝখানে বসিয়া রাজপুত্রের মুখে সেই এক কথা—'স-সে-মি-রা।'

শারদানন্দ আগে হইতে পর্দার আড়ালে বসিয়া ছিলেন। মস্ত পণ্ডিত মহাজ্ঞানী শারদানন্দ। তিনি রাজপুত্রের পিশাচ হইয়া যাইবার সমস্ত ঘটনা ধ্যানবলে জানিতে পারিয়াছিলেন। রাজপুত্রের 'স-সে-মি-রা' শুনিয়া তিনি প্রথম অক্ষর 'স' দিয়া দু' পদ শ্লোক বলিলেন :

সদ্ভাবে যে বন্ধু হল, ঠকিয়ে কি লাভ তায় ?
কোলে যে জন ঘুমিয়ে তারে মেরে কি ফল হায় !

এই শ্লোকটি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার প্রথম অক্ষর 'স' ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'সে-মি-রা—সে-মি-রা'।

তখন শারদানন্দ পর্দার আড়াল হইতে আবার ছোট একটি শ্লোক বলিলেন। এবার আদ্য অক্ষর হইল 'সে' :

সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অথবা গঙ্গাস্নানে
ব্রহ্মহত্যা পাপ দূর হয়,
কিন্তু যে বন্ধুর সাথে শঠতা বঞ্চনা করে
তার পাপ নাহি হয় ক্ষয়।

এবার রাজপুত্র 'সে' অক্ষর ছাড়িয়া শুধু বলিতে লাগিল, 'মি-রা মি-রা'।

শারদানন্দ তখন তৃতীয় শ্লোক বলিলেন,—তার প্রথম অক্ষর হইল 'মি' :

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক সেই জন,
এ তিনের মুক্তি নাই—নরকে কাটায় আজীবন '

শ্লোক শুনিয়া রাজপুত্র 'মি' অক্ষর ছাড়িয়া এবার শুধু বলিতে লাগিল 'রা-রা-রা'।

শারদানন্দ তখন শেষ শ্লোকটি বলিলেন, তার প্রথম অক্ষর হইল 'রা' :

রাজা তোমার ছেলের যদি সত্যিকারের সুকল্যাণ চাও,
দেবতাদের পূজা কর—ব্রাহ্মণদের দান অর্ঘ্য দাও।

এবার রাজপুত্র আর কিছুই বলিল না। শাপমুক্ত হইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। পাত্রমিত্ররা অবাক! মন্ত্রীর মেয়ে কেমন করিয়া এত সব কথা জানিল! রাজারও কেমন সন্দেহ

হইল। তিনি জোর করিয়া সামনের পর্দাখানি সরাইয়া দিলেন। এবার দেখা গেল রাজপুরোহিত শারদানন্দকে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা রাজপুরোহিত শারদানন্দকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার কাছে জোড় হাতে ক্ষমা চাহিয়া লইলেন।

(দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা হইতে)

পুনর্মিলন

এক যে ছিল সওদাগর—তার নাম ধনেশ্বর সাধু। সাধুর ছিল অনেক ধনরত্ন, ঘোড়াশালে ঘোড়া আর দুয়ারে বাঁধা হাতী। এক সময়ে সওদাগরকে ধরিল জুয়াখেলার নেশায়। জুয়ার বাজি ধরিয়া একে একে সওদাগর তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন হাতীঘোড়া হারাইল। সর্বস্বান্ত হইয়া শেষে এক ছেলে এক মেয়ের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির নাম কাজলরেখা—ছেলের নাম রত্নেশ্বর। মেয়েটি বড়।

একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া সওদাগরকে একটি শুক পাখী আর একটি অপরূপ আংটি দিয়া বলিল, 'এই শুকটি হ'ল ধর্মমতী শুক। এই শুকপাখীর কথামত চললে তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে।' এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

দুঃখের সাগরে পড়িয়া একদিন সওদাগর শুককে বলিল, 'বল পাখী, কিসে আমার দুঃখ ঘুচবে। আমার রত্ন-মন্দির ঘর গেল,

হাতী গেল, ঘোড়া গেল—জল খাওয়ার ঘটিটুকুও নেই। এখন বল, কেমন করে ছেলেমেয়ে দুটোকে বাঁচাই।

ধর্মমতী শুক বলিল, 'এবার তোমার দুঃখ শেষ হবে! তুমি বাজারে গিয়ে আংটিটা বেচে এস। সেই টাকায় আবার নৌকো গড়, বাণিজ্য করতে যাও।'

শুকের কথা মিথ্যা নয়। সাধু আংটি বেচিয়া নৌকা গড়িল, বাণিজ্যে গেল—তারপর অনেক ধনরত্ন লইয়া ঘরে ফিরিল। টাকার দুঃখ ঘুচিল সাধুর কিন্তু আর এক দুঃখ গেল না। সুন্দরী কাজলরেখার বর আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সওদাগর শুককে আবার একদিন মনের দুঃখের কথা খুলিয়া বলিল।

শুক বলিল, 'কাজলরেখার বিয়ে হবে মরা এক রাজকুমারের সঙ্গে। ওই মেয়েকে আর ঘরে না রেখে বনবাসে দিয়ে এস। তোমার এ দুঃখ ঘুচতে এখনও অনেক দেরি।'

শুকের কথা শুনিয়া সওদাগর 'হায় হায়' করিয়া কাঁদিতে বসিল। তারপর সন্ন্যাসীর উপদেশ মনে করিয়া একদিন শুকের কথা মতো নৌকো ভাসাইয়া কাজলরেখাকে বনবাসে দিতে চলিল।

নৌকা চলিল উজান ঠেলিয়া। অনেক দূরে আসিয়া পড়িল, এক মহাবন-জনমানবের চিহ্ন নাই। সওদাগর সেইখানে নৌকা থামাইয়া কাজলরেখাকে লইয়া বনের মধ্যে ঢুকিল।

কাজলের ভয় করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল—বাবা তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে।

বনের 'ভতর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহারা অনেক দূর আসিয়া পড়িল। মাথার উপরে দুপুরের রোদ তখন ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। কাজলরেখা আর চলিতে পারে না। তৃষ্ণায় তার গলা শুকাইয়া যায়। এমন সময়ে সামনে দেখা গেল একটা পুরানো মন্দির। তার কবাট বন্ধ। সওদাগর মেয়েকে লইয়া সেই মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

কাজলরেখা বলিল, 'বাবা, একটু জল খাবো।'

সওদাগর গেল জলের সন্ধানে। গেল তো গেলেই।

কাজলরেখা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মন্দিরটা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কবাটে লাগিল তার হাতের ছোঁয়া। অমনি কবাট খুলিয়া গেল। কাজলরেখা মন্দিরের ভিতরটা দেখিতে ঢুকিল। যেই ঢোকা অমনি কবাট বন্ধ হইয়া গেল। শত টানাটানিতেও সে দরজা আর খোলে না। ভয় পাইয়া কাজলরেখা কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সওদাগর ওদিকে জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরের ভিতরে কাজলরেখার কান্না শুনিতে পাইল। তখন দরজায় ধাক্কা দিয়া সওদাগর ডাকিল, 'কাজল, 'কবাট খোল।'

কে খুলিবে সে কবাট! সওদাগর সেটাকে ভাঙিবার চেষ্টা করিল—পারিল না। কাজলরেখা বন্দিনী হইয়া রহিল।

সওদাগর শুধাইল, 'কাজল, মন্দিরের ভিতরে কি আছে?'

কাজলরেখা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'একজন মরা রাজকুমার —সর্বাঙ্গে তার ছুঁচ ফোটানো। তার মাথার কাছে জ্বলছে ঘিয়ের বাতি।'

তাহার কথা শুনিয়া সওদাগর চমকাইয়া উঠিল। মনে পড়িল শুক পাখীর কথা। সওদাগর বলিল, 'মাগো, কাজলরেখা, ওই মরা রাজকুমার তোর এ জন্মের স্বামী। যেমন ক'রে পারিস—স্বামীকে তোর বাঁচিয়ে তুলিস। তুই রইলি তোর কপাল নিয়ে।' এই বলিয়া সওদাগর মহা দুঃখে ঘরে ফিরিয়া গেল।

কাজলরেখা সেই মরা রাজকুমারের মাথার কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কবাট খুলিয়া গেল। কাজলরেখা দেখিল—মন্দিরে একজন সন্ন্যাসী ঢুকিতেছে। কাজলরেখা গিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, 'তোমার কোনও ভয় নেই মা। ওই মরা রাজকুমারকে আমিই এ বনের মধ্যে এনে রেখেছি। ও জন্ম থেকেই অমনি মরে আছে—আমার মন্ত্রের জোরে ও বড়ও হয়ে উঠেছে। এখন তোমার হাতের ছোঁয়ায় ও প্রাণ পাবে।'

কাজলরেখা অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী কতকগুলো কি পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল। সেইগুলি কাজলরেখার হাতে দিয়া বলিল, 'তুমি রাজকুমারের গায়ের ছুঁচগুলো সব তুলে ফেল—সব শেষে তুলবে চোখের ছুঁচ। তারপর চোখে এই পাতার রস ঢেলে দেবে। তাহলেই রাজকুমার বেঁচে উঠবে। কিন্তু খবর্দার, নিজে যেচে তোমার পরিচয় দিতে যেয়ো না। তাহলেই রাজকুমার আবার মরে যাবে। তোমার বাপের সেই শুক পাখীটি এসে রাজকুমারকে যতদিন না তোমার পরিচয় দেয় ততদিন তোমার দুঃখের শেষ হবে না।' এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

তারপর কাজলরেখা সন্ন্যাসীর কথামত একভাবে বসিয়া বসিয়া রাজকুমারের গায়ের ছুঁচ তুলিতে লাগিল—আহার নাই, নিদ্রা নাই। কোন্ দিক দিয়া কাটিয়া গেল সাত দিন সাত রাত। যখন দু'চোখের দুটি ছুঁচ শুধু তুলিতে বাকী, তখন কাজলরেখা গেল স্নান করিতে। মনে ভাবিল—স্নান করিয়া শান্ত পবিত্র হইয়া শেষ ছুঁচ তুলিয়া রাজকুমারের প্রাণ দিব।

মন্দিরের অল্প দূরে মস্ত এক সরোবর। কাজলরেখা স্নানে নামিল, অমনি ঘাটে একজন লোক একটি মেয়েকে লইয়া আসিয়া হাজির। সে বলিল, 'আমার মেয়েটিকে দাসী রাখবে মা। পেটের জ্বালায় ওকে বেচতে বেরিয়েছি।'

কাজলরেখা ভাবিল—হায়, এক বাপ তাহাকে দিয়াছে বনবাসে, আর এক বাপ আসিয়াছে অভাগী মেয়েটিকে বেচিতে।

মেয়েটির দুঃখে কাজলের চোখে জল আসিল। সে হাতের কাঁকন দিয়া মেয়েটিকে কিনিয়া লইল। কাঁকন দিয়া কিনিল, তাই তাহার নাম হইল কাঁকন দাসী। কাঁকন দাসীর বাপ মেয়ে বেচিয়া চলিয়া গেল।

কাজলরেখা কাঁকন দাসীকে, বলিল, 'তুমি ওই মন্দিরের মধ্যে যাও। ওখানে একজন মরা রাজকুমার আছে—চোখে তার ছুঁচ ফোটানো তাকে দেখে ভয় পেয়ো না। তার মাথার কাছে কতকগুলো পাতা আছে। তুমি গিয়ে তার রস করে রাখো। আমি গিয়ে চোখের ছুঁচ তুলে চোখে রস ঢেলে দেবো। তাহলেই রাজকুমার বেঁচে উঠবেন।'

কাঁকন দাসীর মন কুটিল। সে মন্দিরে গিয়া রাজকুমারের চোখের ছুঁচ তুলিয়া ফেলিল, চোখে দিল সেই পাতার রস। অমনি রাজকুমার যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। কাঁকন দাসীকে বলিল, 'তুমি যেই হও -আজ তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, তোমার চেয়ে বড় আপন আমার আর কেউ নেই। আজ থেকে তুমি হলে আমার রানী।'

এমন সময় কাজলরেখা স্নান শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। রাজকুমার তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কে!'

কাঁকন দাসী বলিল, 'ওকে আমার কাঁকন দিয়ে কিনেছি—ওর নাম কাঁকন দাসী।'

কাজলরেখার কান্না পাইল। তবু সন্ন্যাসীর কথা মনে করিয়া সে নিজের পরিচয় দিল না। সেদিন হইতে কাঁকন দাসী হইল রাজরানী, আর কাজল হইল কাঁকন দাসী।'

তারপর রাজপুত্র একদিন ফিরিয়া চলিল নিজের রাজ্যে। কাজল তাহাদের সঙ্গে গেল দাসীর মত। দেশে ফিরিয়া রাজকুমারের নাম হইল ছুঁচ রাজা

কাজলরেখা রাজবাড়িতে দাসীর মত থাকে—দাসীর মত খায়। জল তুলে, বাসন মাজে, নকল রানীর সেবা করে। তবু রানীর মন পায় না। এমনি করিয়া দিন কাটিতে থাকে।

এদিকে রাজকুমারের কেমন সন্দেহ হয়। নকল রানীর ব্যবহার বড় খারাপ—দাসী-চাকরানীর মত তার কথাবার্তা,

চালচলন। আর কাজলরেখার গুণের সীমা নাই। যেমন রূপ তেমনি তাহার মিষ্টি স্বভাব। ওদের দুইজনকে পরীক্ষা করার জন্য রাজকুমার একদিন নকল রানীকে বলিল, 'আমি দেশভ্রমণে যাবো—তোমার জন্যে কি আনব বলো।'

নকল রানী দাসী-চাকরানীর মতই বলিল, 'বেতের বাক্স, বেতের কুলো, তেঁতুল কাঠের ঢেঁকি, পিতলের নথ, আর কাঁসার মল।'

রাজকুমার তো অবাক, তারপর সে কাজলরেখাকে শুধাইল, 'তোমাব জন্যে কি আনব, বলো।'

কাজল বলিল, 'আমার কিছু দরকার নেই—আপনার ঘরে আমি খুব সুখে আছি!' কিন্তু রাজকুমার খুব পীড়াপীড়ি করাতে বলিল, 'তবে আমার জন্যে একটা ধর্মমতী শুক কিনে আনবেন।'

রাজকুমার দেশভ্রমণে গেল। নকল রানীর জিনিস পাওয়া গেল সহজেই কিন্তু কাজলরেখার ধর্মমতী শুক আর কোথাও পাওয়া যায় না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া গেল সে ধনেশ্বর সাধুর দেশে। ঢোল শহরৎ করিয়া জানাইয়া দিল—যত টাকা লাগে ধর্মমতী শুক তাহার চাই।

ধনেশ্বর সাধু সে কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল—কে চায় এই ধর্মমতী শুক! নিশ্চয়ই কাজলরেখা। সাধু রাজকুমারকে শুক পাখী দিয়া বিদায় দিল। রাজকুমার খুশী মনে নিজের রাজ্যে ফিরিয়া চলিল।

ঘরে ফিরিয়া রাজপুত্র মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করিতে বসিল। কেমন করিয়া পাওয়া যায় রানীর আর দাসীর পরিচয়।

মন্ত্রী বলিল, 'আপনি যখন ছিলেন না তখন দু'জনকেই আমি রাজ্যের কাজকর্মের কথা জিজ্ঞেস করেছি। দেখেছি—রানীর বুদ্ধি নেই, কিন্তু দাসী খুব বুদ্ধিমতী।'

রাজপুত্র ভাবিতে লাগিল।

মন্ত্রী বলিল, 'আপনি আর একটা পরীক্ষা করুন। আপনার বন্ধুদের খেতে নেমন্তন্ন করুন। দু'জনকেই রাঁধতে দিন, কে কেমন রাঁধে তাতেই জানতে পারবেন দু'জনের গুণ।'

মন্ত্রীর কথামত রান্নার ভার পড়িল দু'জনের উপরে। যে যেমন লোক—সে তেমনি রাঁধিল। নকল রানী রাঁধিল—চালতার টক, টক-ঝাল আর মুখ কুট্-কুট্-করা কচু শাক। আর দুঃখিনী কাজলরেখা রাঁধিল পরমান্ন, পঞ্চাশ তরকারি—দুধ-ক্ষীরের ছড়াছড়ি।

ছুঁচ-রাজা সব দেখিল। তারপর আবার একটা পরীক্ষা করিল। লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন দাসী আর নকল রানীকে ডাকিয়া বলিল, 'আমার বন্ধুরা আসবে—যে যত সুন্দর করে পার আলপনা আঁকো।'

নকল রানী আঁকিল—কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, ধানের ছড়া, হাঁড়ি-পাতিল। আর কাজলরেখা আঁকিল সকলের আগে বাপ-

মায়ের চরণ, মঙ্গল কলস, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, আর কত দেবদেবী, বিদ্যাধর, কত নদ-নদী পর্বত। শেষে আঁকিল মন্দিরের মাঝখানে সেই মরা রাজকুমার। শুধু আঁকিল না নিজেকে। আলপনা আঁকিয়া কাজল ঘিয়ের বাতি জ্বালিয়া দিল।

তারপর নকল রানীর আলপনা দেখা সারিয়া সবাই আসিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইল কাজলের আলপনার সামনে। সবাই বুঝিতে পারিল—এ কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে না হইয়া যায় না।

তাই দেখিয়া নকল রানী জ্বলিতে লাগিল আর কাজলরেখা ঘর বন্ধ করিয়া মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল।

কান্না শুনিয়া শুক পাখী বলিল, 'কেঁদো না কাজল। তোমার দুঃখের দশ বছর কেটেছে—বাকী আরও দু'বছর। ধৈর্য ধর। তোমার দুঃখের শেষ একদিন হবেই।'

কিন্তু কোথায় দুঃখের শেষ! নকল রানীর অত্যাচার বাড়িয়া গেল। সে অনেক রকম ষড়যন্ত্র করিয়া ছুঁচ-রাজার মন বিষাক্ত করিয়া তুলিল। মনের অশান্তিতে ছুঁচ-রাজা একদিন বিরক্ত হইয়া আদেশ দিলেন, 'যাও দাসীকে বনবাসে দিয়ে এসো।'

হায়, আবার বনবাস! নৌকা চলিল কাজলরেখাকে লইয়া কত দেশ কত নদী পার হইয়া। কাজলরেখা চলিল কাঁদিতে কাঁদিতে।

পথের মাঝখানে ছুঁচ-রাজার এক বন্ধু বলিল, 'তোমার কান্না থামাও কন্যে। আমি তোমাকে বিয়ে করব। আমি কাঞ্চনপুরের এক কোটিপতির ছেলে। চল আমার সঙ্গে—তোমার কোনও ভয় নেই।'

কাজল বলিল, 'না। রাজকুমার আমাকে বনবাসে দিতে বলেছেন—বনবাসই দাও।'

এদিকে নৌকা গিয়া পড়িল সমুদ্রে। কিন্তু এমনি কপালের দোষ, সমুদ্রেও যেন চড়া পড়িয়া গেল। নৌকা চড়ায় বসিয়া গেল। তখন দাঁড়ি-মাঝিরা বলিল, 'এই মেয়েটা পোড়াকপালী ডাইনী। ওকে এই চড়ায় রেখে পালাই চল।'

কাজলরেখাকে সেই চড়ায় নামাইয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। চড়ায় শুধু নলখাগড়ার বন। কাজলরেখা সেই নলখাগড়ার রস খাইয়া বাঁচিয়া রহিল।

তারপর একদিন খুব বড় একটা ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল কোন এক সওদাগরের নৌকা। সকালে ঝড় যখন থামিল, তখন নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিল সওদাগর রত্নেশ্বর সাধু—কাজলরেখার ভাই। ছোট বেলাতেই কাজলরেখার সহিত তাহার ছাড়াছাড়ি। তারপর বার বৎসর কাটিতে চলিল। ধনেশ্বর সাধু মরিয়া গিয়াছে—ছেলে রত্নেশ্বর এখন হইয়াছে সওদাগর। রত্নেশ্বর দেখিল—চরের উপরে অপরূপ সুন্দরী এক কন্যা। ভাইবোন কেহ কাহাকেও

চিনিতে পারিল না। তবু সাধু রত্নেশ্বর ঘরে ফিরিবার সময় দুঃখিনী কাজলরেখাকে চর হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিল।

ঘরে ফিরিয়া কাজলরেখা সব চিনিতে পারিল। চিনিতে পারিল বাপের ঘরের খুঁটিনাটি সব কিছু। বাপ-মা দুজনেই মারা গিয়াছেন। তাঁহাদের কথা মনে করিয়া কাজলরেখা মনের দুঃখে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রত্নেশ্বর শুধাইল, 'কার কন্যা তুমি—কোথায় তোমার ঘর। তোমার পরিচয় বল।'

কাজল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার যে পরিচয়—আমি বলতে পারি না। বলা নিষেধ। ছুঁচ-রাজার দেশে আছে ধর্মমতী শুক—সেই জানে আমার পরিচয়। তাকে যদি আনতে পার—তাহলেই জানতে পারবে সব।'

রত্নেশ্বর লোকলস্কর পাঠাইল ছুঁচ-রাজার দেশে।

এদিকে ছুঁচ-রাজার তখন পাগল হইতে বাকী। কাজলরেখাকে বনবাসে পাঠাইয়া তাহার দুঃখের সীমা নাই। নকল রানীর ব্যবহারে তাহার জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্‌। এমন সময় শুক পাখীর খোঁজে আসিল সওদাগর রত্নেশ্বরের লোকলস্কর। নকল রানী টাকার লোভে শুক পাখীটি কি-না-কি ভাবিয়া বেচিয়া দিল। রত্নেশ্বরের লোকলস্কর ফিরিয়া চলিল শুক পাখী লইয়া। তাহাদের পিছনে পিছনে ছুঁচ-রাজাও চলিল পাগলের মত।

তারপর সওদাগর রত্নেশ্বরের ঘরে একদিন যেন হাট বসিয়া গেল।

শুক পাখী কাজলরেখার দুঃখের কথা বলিবে—সে কথা শুনিবার জন্য কত লোক ছুটিয়া আসিল। তাহারা জানিত—কাজলরেখা জলপরী—সাধু রত্নেশ্বর তাঁহাকে কোন সমুদ্র হইতে ধরিয়া আনিয়াছে। জলপরীর পরিচয় শুনিবার জন্য দেশের লোক ভাঙিয়া পড়িল। তাহাদের সকলের পিছনে বসিয়া রহিল ছুঁচ-রাজা।

সকলের সামনে সোনার খাঁচায় করিয়া ধর্মমতী শুককে আনা হইল। ধর্মমতী শুক তখন বলিতে লাগিল দুঃখিনী কাজলরেখার দুঃখের কাহিনী। বলিল—কেমন করিয়া কাজলরেখা ছুঁচ-রাজার প্রাণদান করিয়াছে, কেমন করিয়া কাঁকন দাসী তাহাকে ঠকাইয়া নিজে রানী হইয়া বসিয়াছে। শেষকালে দিলো ভাই আর বোনের পরিচয়। শুক বলিল, 'আজ কাজলরেখার দুঃখের বারটি বছর শেষ হইল।' এই বলিয়া শুক স্বর্গের দিকে উড়িয়া চলিয়া গেল।

রত্নেশ্বর ছুটিয়া গিয়া দিদির হাত মুঠা করিয়া ধরিল। দুইজন দুইজনের দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর ছুঁচ-রাজার সঙ্গে কাজলরেখার বিবাহ হইয়া গেল।

দেশে ফিরিয়া ছুঁচ-রাজা নকল রানী কাঁকন দাসীকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিল।

(মৈমনসিংহ গীতিকা হইতে)
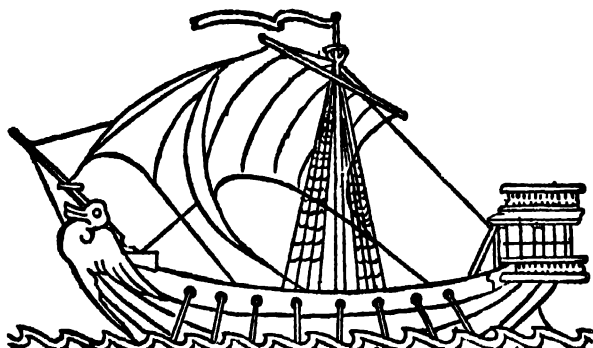
পরিশিষ্ট

ঋগ্বেদ—দেবতাদের উদ্দেশে রচিত স্তোত্র—ইহার সংখ্যা ১,০২৮টি। বিভিন্ন ঋষি বা কবিদের দ্বারা এগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়। পরে এগুলি সংকলিত হয় খৃষ্ট জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে। ঋগ্বেদই জগতের প্রাচীনতম রচনা। এর স্তোত্রগুলির মধ্যে কাহিনী আছে অনেক—যেগুলিতে আদিম সমাজের বহু কথা ও ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ—বেদের পরবর্তীকালে এগুলি রচিত হয়। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেই বেদের স্তোত্র বা মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আছে বৈদিক যুগের যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ। শুনঃশেফের কাহিনীতে সেকালের যজ্ঞক্রিয়া ও সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি চিত্র পাওয়া যায়।

উপনিষৎ—বেদের কর্মকাণ্ড যেমন ব্রাহ্মণ, তেমনি তাহার জ্ঞানকাণ্ড হইল উপনিষৎ। সত্যানুসন্ধান ছিল সেকালের উপনিষদের মূল কথা। উপনিষৎ সংখ্যায় অনেকগুলি, তাহাদের মধ্যে ছান্দোগ্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ঋষিদের সত্যোপলব্ধি বুঝাইবার জন্য যে আখ্যায়িকাগুলি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার মত সরস ও সুন্দর আখ্যান অন্যান্য উপনিষদে দুর্লভ।

জাতক—জাতকগুলি বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধদেবের অতীত জন্মের কাহিনী। পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের একশত বৎসর পরে বৈশালীতে বৌদ্ধদের যে মহাসম্মেলন হয় সেইখানেই জাতকমালার সঙ্কলন করা হয়। অর্থাৎ এ ঘটনা ঘটে খৃষ্ট জন্মের অন্তত ৩৭০ বৎসর পূর্বে। জাতকের গল্পে প্রাচীন ভারতের বহু লোক-কথা আসিয়া মিশিয়াছে। 'পদচিহ্নকুশলী' একটি প্রাচীন রূপকথার নিদর্শন।

কথাসরিৎসাগর—লেখক সোমদেব, জন্মস্থান কাশ্মীর। ১০৬৩-১০৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গুণাঢ্যের প্রাচীন 'বৃহৎ কথা' এই গ্রন্থের ভিত্তি। সাগরের অশ্রান্ত তরঙ্গের মতই এই গ্রন্থে গল্পের পর গল্প—বাঁধা আছে একটি ক্ষীণ যোগসূত্র। ইহার মধ্যেও নানা লোক-কথার সমাবেশ ঘটিয়াছে।

হিতোপদেশ—লেখকের নাম নারায়ণ। সম্ভবত তিনি ছিলেন বাঙালী। তিনি ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আবির্ভূত হন। বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' অবলম্বনে লেখা নারায়ণের 'হিতোপদেশ'ই কালে রচনা-গুণে অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। সুহৃদ্ভেদ, মিত্রলাভ, যুদ্ধ ও শান্তি ইত্যাদি নানা বিষয়ে রাজকুমারদের শিক্ষার জন্যই কাহিনী-গুলি গ্রথিত হইয়াছিল।

বেতালপঞ্চবিংশতি—লেখক শিবদাস, সম্ভবত তিনি জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকালও সঠিক জানা যায় না। ইহার রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া কালিদাসের নামে চলিতে থাকে। ইহার রচনার চাতুর্য ও বুদ্ধি লক্ষণীয়।

দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা—রচনাটি কালিদাসের নামে প্রচলিত, আসল রচয়িতার পরিচয় আজও অজ্ঞাত। কাব্যগুণ অপেক্ষা এটির আখ্যায়িকা গুণই প্রধান এবং সেই গুণেই এটি বহুকালের জনপ্রিয় গ্রন্থ।

মৈমনসিংহ গীতিকা—পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য কবিদের রচিত কতকগুলি পালা গানের সংকলন। এই গীতিকাগুলির কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লেখা—কিছু বা উপাখ্যান। কাজলরেখার কাহিনী প্রাচীন বাঙলার রূপকথার নমুনা।